প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৭
নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলকাতা-৯

মুদ্রক : নবদ্বীপ বসাক
পাবলিসিটি কনসার্ন
৩ মধু গুপ্ত লেন / কলকাতা-১২

ভূমিকা

নিগ্রো লেখকরা কী লিখছেন, কেন লিখছেন, তাঁরা কী ভাবছেন, কেন ভাবছেন, বিশ্বের অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁদের সত্যিকার পার্থক্য কোথায়—এইগুলিরই একটি সংক্ষিপ্ত মানচিত্র পাঠক-পাঠিকাদের কাছে উপস্থিত করার জন্যে আলোচ্য সংকলনটি করা হয়েছে। অধিকৃত আফ্রিকার বনে-জংগলে, পাহাড়ে-পর্বতে, নদী-নালায়, ঘেটো আর লোকেশন'গুলির মধ্যে যে নির্যাতীত প্রাণ-প্রাচুর্য মন্থর গতিতে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে এগিয়ে চলেছে, গাথা গান কাব্য ছোটো গল্প আর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে নির্যাতীত যে জীবন তার আলস্য ভেঙে বিপুল আবেগে জেগে উঠছে কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে তার কিছুটা পরিচয় হবে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে। যে সব লেখকদের গল্প এই সংকলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাঁদের অনেকেরই বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মতো—কিছু বেশিও; আমেরিকা ও আফ্রিকার জীবিত ও মৃত লেখকদের মোট সতেরটি গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে তুলনা করলে এই সংখ্যাটিও নগণ্য; কিন্তু ভাবনা-চিন্তা, বিষয় আর ভাববস্তুর দিক থেকে এই গল্পগুলির মধ্যে একটি একাত্মতার সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেই সুরটি হচ্ছে আর্তনাদের, প্রবঞ্চনার, দুঃখের, একটি নিঃসঙ্গতার; আর সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে একটি আপসহীন সংগ্রামের সুর। এই গল্পগুলির মধ্যে কালো মানুষদের এলাকার একটি ছবি ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। কয়েকটি গল্পের মধ্যে ঝলছে উঠেছে ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ শিখা, কয়েকটির মধ্যে প্রজ্বলিত হয়েছে ক্রোধবহ্নি, কোথাও-কোথাও বা তির্যক রসিকতা; কিন্তু সব লেখাগুলির মধ্যেই রয়েছে একটি তীব্র প্রতিবাদ—কালো মানুষদের উপরে সাদারা যে জঘন্য অত্যাচার করছে তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার সরব আর মাঝে-মাঝে নীরব হুংকার। 'আফ্রিকা, আমাদের আফ্রিকা ফিরে এস'—এই নিঃসঙ্গ আর্তনাদটি আলোচ্য গল্পগুলির শিরায় শিরায় এমন মর্মান্তিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যেটিকে না শুনে কিছুতেই আমরা পারি নে। এইটিই হচ্ছে পরাধীন আফ্রিকার মর্মবাণী—স্বাধীনতা অর্জনের বাণী—ভবিষ্যৎ আফ্রিকার স্বপ্ন আর সাধনা।

আলোচ্য গল্পগুলির স্বাদ আস্বাদন করতে গেলে নিগ্রোদের জীবনযাত্রার সঙ্গে কিছুটা পরিচয় আমাদের থাকা দরকার। নিগ্রোদের শাসন করার শ্বেত-দায়িত্ব আজ যাদের ওপরে তারাই আজ অদৃষ্টের অমোঘ পরিহাসের ভূমিকা গ্রহণ করেছে; তারাই হচ্ছে এদের ভাগ্যবিধাতা। ন্যায়পরায়ণতার মুখোস প'রে সাম্যবাদ আর খ্রিস্টীয় সভ্যতার নামে, মানবতা এবং সংস্কৃতি প্রচারের

নামে, অর্ধশিক্ষিত নিগ্রোদের বস্তির উঠোনে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার নামে তাদের ঘাড়ে যে দারিদ্র্যের, নির্যাতনের, অসম্মানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা আমাদের নেই। নিগ্রো অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির দারিদ্র্য, তাদের শহরতলী আর বাড়ির উঠোনগুলি থেকে ছড়িয়ে পড়া দুর্গন্ধ, জাতি-বৈষম্যের শিকার সেই সব কালো মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে অসহনীয় বিষন্নতা স্তিমিত চিতাবহ্নির মতো ধূমায়িত হয়ে উঠেছে—তা সত্যিই শ্বাসরোধকারী। সেইসব অঞ্চলগুলির মধ্যে না আছে হাত পা ছড়িয়ে বসার জায়গা, না আছে আলো, বাতাস, জল আর আগুনের ব্যবস্থা ; ঝড়ো আর ঠাণ্ডা বাতাসের দ্বার সেখানে অবারিত। অনেক সময় দশ থেকে পনের জন নারী-পুরুষ-শিশুকে একটি বা দুটি বস্তি ঘরে গাদাগাদি বা জড়াজড়ি করে পড়ে থাকতে হয় কোনো রকমে—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। পারিবারিক জীবনের আব্রু তাদের কাছে বিদেশী বস্তু, আনন্দ, নিরাপত্তা কী তারা তা জানে না ; এক কথায়, মানুষের সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম প্রয়োজনের স্বীকৃতি তাদের নেই। তাদের রাস্তাঘাট মাটির, কর্দমাক্ত, অসমতল, পাহাড়ী ; প্রস্রাব আর নোংরা দূষিত আবর্জনায় সেগুলি আকীর্ণ। এত দুঃখের মধ্যেও তাদের সৌন্দর্যবোধ পাঁকের মধ্যে পদ্মফুলের মতো ফুটে রয়েছে :

"Yet in the midst of misery and squalor, you will find an assertion of man—a flower box, a carefully tended garden, a bit of elaborately decorated wall, painted with traditional designs, the sounds of guitar music and singing, the warmth of laughter ['A Note on South African Life and Letters' by Herbert].

এক দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তিরিশ লক্ষের বেশি নিগ্রো কাজ করে শ্বেতাঙ্গদের খামারে। তাদের না আছে বাড়ি-ঘর, না আছে জাতির সঙ্গে সত্যিকার বন্ধন, আর না আছে পরিবার বলতে কিছু, এক কথায় ছিন্নমূল তারা ; নিজেদের দেশেও তারা বাস্তুহারা। শহরে যারা কোনো রকমে মাথাগুঁজে থাকে তাদের সংখ্যাও পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি ; কিন্তু আইনের দৌলতে শহরে বাস করার অধিকার তাদের নেই। তারা মাটি কাটে, পরিশ্রম করে, সংগ্রাম করে, গান গায়, নাচে, লেখে—এবং এইভাবে শহরে সংস্কৃতির স্পর্শে আসে তারা। কিন্তু তাদের কোনো সময়েই ভুলতে দেওয়া হয় না যে তাদের গায়ের রং কালো ; সাদাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য অনেক। আর তারই মধ্যে দিয়ে তারা বেড়ে ওঠে ক্ষুব্ধ, দুঃখ আর ভীতিকে সম্বল করে। শিশুরা খেলতে-খেলতে গান গায় : ওই থানার দিকে তাকিয়ে দেখ / ওখানে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশরা / ওরাই আমাদের সব চেয়ে মারাত্মক অসুখ / ওইখানে।

তাদের বাপমায়েরা ঘুম থেকে ওঠে খুব ভোরে—তিনটে থেকে চারটের মধ্যে—অন্ধকার থাকতে থাকতে ; বেরিয়ে যায় দশ থেকে বারো মাইল দূরে শহরে শ্বেতাঙ্গদের বাড়িতে কাজ করতে ; বাড়িতে ফিরে আসে রাত্রি আটটা থেকে নটার মধ্যে। এই সময়টা তাদের ছেলেমেয়েদের দেখার কেউ থাকে না ; পথে-ঘাটে, নদী-নালায়, বাপ-মা-হারা ছেলেদের মতো ঘুরে বেড়ায় তারা—একেবারে স্বরাজ্যে সম্রাট। কেউ কেউ হয়ত স্কুলেও যায় ; কিন্তু তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। ধাক্কা খেতে-খেতে জীবনের পাঠশালায় শিখতে শিখতে বেঁচে ওঠে তারা—শ্বেতাঙ্গদের সৃষ্টিকরা জাতি-বৈষম্যের [Apartheid] জগৎটা কী তা তারা বুঝতে পারে। তার পরে, কাজ করার মতো বয়স হলেই বাপ-মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথারীতি তারা অংশ গ্রহণ করে জীবনসংগ্রামে। কিন্তু কাজ চাইলেই এই জগতে কাজ পাওয়া যায় না। তার জন্যে আরও কিছু আছে। 'you go to the pass office, and become a number instead of a name'! কাজ যদি বা পাওয়া গেল, তার জন্যে সদর রাস্তা খোলা নেই তাদের জন্যে। তাদের ঢুকতে হবে আলাদা পথ দিয়ে, তাদের মাথা গোঁজার জায়গা আলাদা ; ট্রেনে উঠতে গেলে তাদের দাঁড়াতে হবে আলাদা প্ল্যাটফর্মে ; তাদের জন্যে নির্দিষ্ট রয়েছে ট্রেনের পৃথক কামরা। শ্বেতাঙ্গদের ছায়া মাড়ানো তাদের চলবে না। কিন্তু এত করেও কি নিস্তার আছে? সব সময়েই একটা আতংক কখন পুলিশে এসে হামলা করবে। সব সময় ভয় বন্দুকের খোঁচার আর নির্মম প্রহারের, পোড়া আঙুলের আর পেটের ওপরে হোস পাইপ খুলে জল ঢেলে দেওয়ার। বিন্দুমাত্র কারণ, এবং অনেক ক্ষেত্রে অকারণেই জেলে ঢোকার ভয়ঃ Waar's jou pas, Jong ? Where's your pass, boy ? Day and day, you are followed by pick-up vans'.

এরাই হচ্ছে কালো মানুষ আর তার জীবন। কিন্তু এরই মধ্যে জেগে উঠেছে একটি নতুন জাতি, নতুন সংস্কৃতি—স্বাধীনতার জন্যে তারা মরণপন করে চলেছে কাব্য, গল্প আর উপন্যাসের হাতিয়ার নিয়ে।

বিজন ঘোষ

কলকাতা

সুনীল কুমার ঘোষ

সূচীপত্র

॥ আফ্রিকা ॥

॥ আমেরিকা ॥

কম্বল

অ্যালেক্স্ লা গুমা

বোকারের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্ত্রীলোকটির মাথার কয়েক গাছা শ্রান্ত চুল ওর মুখে প্রবেশ করেছে, তাতে বাসি কেশরঞ্জক ব্রিলিয়ানটিনের স্বাদ। দেহভারটুকু সরিয়ে নিতে প্রাচীনকালের ডাবল বেড খাটের গদী ঝুলে পড়ল। দোমড়ানো শ্বেত-ধূসর বালিশে ওদের দুজনের মাথার চাপে কালো দাগ ধরেছে, আর এক জায়গায় ঘসালাগা লিপষ্টিকের দাগ প্রায়-সেরে আসা ক্ষতের মত দেখাচ্ছে। বিগত রজনীর সুরাপানজনিত অবসাদে মুখটা বিস্বাদ ঠেকছে আর মাথাটা ধরে উঠেছে।

আধো-ঘুম, আধো-জাগরণে স্ত্রীলোকটি মাঝে মাঝে বলে উঠছে 'নো ম্যান', 'নো ম্যান', কম্বলের তলায় তার দেহখানি ঘাম-ঘাম, ভিজে-ভিজে, সারা বিছানায় সস্তা সুগন্ধির সুরভি, ছড়ানো পাউডার ও শিশুর প্রস্রাবের গন্ধ মিলেমিশে একাকার। জানালার ওপরকার ছাপ ওঠা বিবর্ণ পরদাটা ওকে যেন হাতছানি দেয়, উত্তপ্ত হাওয়ার দিকে টানে। প্রত্যুষের সেই ধূসর বিবর্ণ ম্লান আলোয় একটা পিতলের হাতলে ঝোলানো ছিন্ন অন্তর্বাসটিকে প্রেতের মত দেখায়।

নিজেকে রুক্ষ এবং অবসন্ন মনে হয় বোকারের। অধৌত, প্রাচীন কম্বলখানা ওর মুখের ওপর ঘসড়ায়, আরও অনেকরকম গন্ধের সঙ্গে এই গন্ধটাও নাকে আসে। আবছা মনে জাগে যে এই ধরনের কম্বলের তলায় শুয়ে একসময় দিন কাটাতে হয়েছে। মনে মনে কোনো একটা প্রথমশ্রেণীর হোটেলের সদ্য-ধোলাই করা বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমানোর বাসনা মনে জাগে। একটা ঠাণ্ডা বীয়ার পানের তৃষ্ণায় এ ইচ্ছাটা আপাততঃ চাপা পড়ে। মনে মনে বিরক্তি জাগে, বিছানাটা ওর দিকে ঠেলে দেয়।

কম্বলের ভিতর পাশ ফিরে স্ত্রীলোকটি ঘুম-ঘুম গলায় প্রতিবাদ জানায়—বোকার গাল দিতে দিতে উঠে পড়ে। বিছানার স্প্রীং-এর আকুল ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে মেঝের অপর প্রান্তে টিনের বাথটবে শায়িত বাচ্চাটার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সে ককিয়ে কেঁদে ওঠে। দন্তহীন মুখের সেই ক্রন্দন প্রাচীন দেয়াল ছাপিয়ে ওঠে। বিছানার প্রান্তে বসে বোকার মনে মনে এই বাচ্চা এবং তার জননীকে গাল পাড়তে থাকে। সে ভাবে কেন যে মরতে অপর একজনের স্ত্রীর ঘরে এলাম, তার ওপর একটা বাচ্চাও আছে। ওদিকে টিনের বাথটবে শায়িত শিশুটা কেঁদেই চলেছে একটানা।

রাগের বশে সে বাচ্চাটির উদ্দেশে ধমক দিয়ে চেঁচায়—'আঃ।' এতক্ষণে স্ত্রীলোকটির ঘুম ভাঙ্গলো। নোঙরা বালিশ থেকে মাথা উঠিয়ে আলু-থালু ভঙ্গীতে সে বোকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর ধমকের ভঙ্গীতে বলে ওঠে—'এমন ষাঁড়ের মত চেল্লাচ্ছো, দিলে ত' ছেলেটাকে জাগিয়ে—।'

বোকার রেগে বলে—'মুখ সামলে কথা বলো। উঠে গিয়ে তোমার ঐ হতভাগা বাচ্চাটাকে দেখগে যাও।'

উঠে দাঁড়িয়ে বিছানার চারপাশে ঘুরপাক খেয়ে বোকার তার সার্ট ও ট্রাউজার টেনে নেয়। স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করে—'চল্‌লে নাকি।'

'নিশ্চয়ই, একশো বার। তুমি কি মনে করো এইসব চ্যাঁ-ভ্যাঁ আমার খুব ভালো লাগে।'

একটু চটে উঠে স্ত্রীলোকটি বলে—'তা আমার কি দোষ!' তুমি ত' বন্ধু আগেই জানতে আমার একটা বাচ্চা আছে।'

ওদিকে শিশুটি একটানা কাঁদছে। ট্রাউজারটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে সার্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে বোকার গজ গজ করে—'যত সব বাচ্চা-টাচ্চা।'

মেয়েটি এবার একটু নরম গলায় প্রশ্ন করে—'তুমি আবার ঘুরে আস্‌ছো ত?'

'হয়ত তাই, হয়ত নয়। কে জানে।'

মেয়েটি আবার বলে ওঠে—'দেখো, আবার যখন আসবে একটু সতর্ক হয়ে এসো। বুঝ্‌লে। আমার কর্তা তোমাকে দেখুক, এ আমি চাই না। সে হয়ত তোমাকে নিয়ে একটা যাহয় কাণ্ড করে বস্‌বে।'

'ঐ লোকটা! হা ভগবান! জানো আমি খালি হাতেই ওকে একেবারে দুখানা করে ফেলতে পারি।'

ঘরে বিশাল দেহ বিস্তার করে দাঁড়িয়ে বোকার অট্টহাস্য করে ওঠে।

বিরাট আকৃতি—পেশীগুলি ইস্পাতের টুক্‌রোর মত ফোলা-ফোলা। তেল-তেলে হাত দুটো কাজ করার চেয়ে লোক-ঠ্যাঙানোর জন্যই যেন তৈরী হয়েছে।

মেয়েটি বলে—'বেশ ভাই বেশ, তবে কি জানো, যদিও আমাকে ও ত্যাগ করেছে, তবু চায় না, অপর কেউ আমার ঘরে আসে। হয়ত বাইরে থেকে তোমার ওপর নজর রেখেছে।'

বোকার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে ওঠে—'চুলোয় যাক লোকটা, জাহান্নমে যাক ওর মা—'

মেয়েটি এ কথার জবাব দেয় না। দোদুল্যমান শয্যা থেকে সরে এসে বাচ্চাটাকে দেখার উপক্রম করে। থলথলে পেটিকোট পরা অবস্থায় বিছানার ধারটিতে এসে বসে শিশুটাকে স্তন্যদানের উদ্যোগ করে।

তারপর সে বলে ওঠে—'একটু যদি অপেক্ষা করো তাহলে চা বানিয়ে দিই।'

'ছেড়ে দাও ওসব।'

ওর দিকে তাকিয়ে বোকার মাথা নাড়ে আর একটা বিশ্রী শব্দ করে বেরিয়ে যায়।

এই বাড়ির বারান্দা ধরে অন্য সব কামরাগুলি পার হয়ে বোকার চলতে থাকে, মাথার যন্ত্রণার জন্য বিরক্তিভরে ভ্রু কুঞ্চিত করে। মুখে আর গলায় একটা অস্বস্তিকর বিস্বাদ। এ বাড়িটার কাঠের এই বারান্দার মাঝে মাঝে বেশ ফাটল—ভারী দেহ সামলিয়ে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে সে চলতে থাকে।

এই পূতিগন্ধময় বাড়িটার বাইরে সূর্যালোক নেমেছে। সে বাইরের কলটির দিকে এগিয়ে চলে। একদা এটি একটা সাজানো বাগান ছিল—এখন সব শুকিয়ে গেছে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে সে তৃষ্ণা মিটিয়ে জলপান করল। তারপর চোখে মুখে কিছু জল ছিটিয়ে নিল। সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে ভাবতে থাকে—মেয়েটা চুলোয় যাক্। আর কোনোদিন যদি এখানে আসি—তাহলে আমি কুকুর।

সুমুখপানে চারপাশে প্রাচীন জরাজীর্ণ বাড়ি আর কাঠের প্যাকিং বাক্স, টিন ইত্যাদি দিয়ে বানানো কিছু ঝুপড়ি—এটা শহরতলীর বস্তি অঞ্চল। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে কুকুর আর মুরগীরা যে যার পথ ধরেছে। এই ভাঙাচোরা অলিগলি পথে ও অলসমনে চলতে থাকে। পথচলা মানুষজন ওকে একটু এড়িয়ে পাশ কাটাচ্ছে, কেউ কেউ বা মামুলী শুভেচ্ছা জানিয়ে দ্রুত পায়ে সরে পড়ছে। ওর দুর্নাম সম্পর্কে তারা সচেতন। টলোমলো হালভাঙা নোঙরহীন নৌকার মত ও নোংরা নালার বাসিন্দা।

একটা পাঁচিল ঘেরা প্রান্তরে বোকার এসে পড়েছে—এমন সময় তিনজন লোক ওর পিছন দিককার একটি গেট থেকে বেরিয়ে এল। ওদের ভিতর

একজন চেঁচিয়ে ওঠে—'এই সেই লোকটা।' তারপর ও পিছন ফিরে তাকানোর আগেই একটা তীক্ষ্ণ ছুরির জ্বলন্ত ফলক ওর দেহে বসিয়ে দেয়, বোকার যন্ত্রণায় আকুল হয়ে ওঠে। মাথা ও দেহের বেদনা একই সঙ্গে সমগ্র শরীরে অনুভূত হয়। গালাগাল দিতে দিতে ও মাটিতে পড়ে যায়। ওর আঘাতের তীব্রতা পরীক্ষা করার জন্য ওরা কিন্তু এতটুকু দাঁড়ালো না, বরং ওর লৌহ-কঠোর শরীরের কাছ থেকে প্রত্যাঘাত পাবার ভয়ে পালালো। পথের ওপর ও পড়ে রইল রক্তাক্ত দেহ নিয়ে।

পথের ওপর পড়ে বোকার যন্ত্রণায় ছটফট করে, তার গায়ের চামড়া রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দেখা গেল পা দুটি অচল হয়ে পড়েছে। আর হাত দুটি কোনো ক্রমে দেহটাকে ওঠানোর কাজে লাগছে না। আততায়ীদের প্রাণভরে গাল দিতে দিতে ও সেই ভাবেই পড়ে থাকে, ইতিমধ্যে ওর চারপাশে কিছু ভীড় জমে গেছে। উত্তেজিত গলায় সবাই কথা বল্‌ছে।

কেউ বল্‌ছে—'ওকে পথ থেকে তুলে নেওয়া যাক।'

'এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে রাজী নই, বুঝ্‌লে?'

'কিন্তু, বন্ধু, তাই বলে ওকে এভাবে পথের ওপর ফেলে রাখা যায় না।'

'তার চেয়ে বরং কোনো দোকান-টোকানে গিয়ে এ্যামবুল্যান্সে খবর পাঠাও।'

'সেই ভালো। ওদের কাউকে দেখতে পেয়েছ নাকি?'

'দেখো ভাই সাঙাৎ, তোমাকে স্পষ্ট বলছি আমি কোনো কিছুই দেখিনি।'

'যাক, এখন ওকে উঠিয়ে নাও। ফ্রেডি পায়ের দিকটা ধরো—সিম্‌পি তুমি ওকে একটু ভাই সাহায্য করো—আমি আর পয়েনটস্‌ দুজনে হাত দুটো ধরতে পারবো।'

ঐখানে ওভাবে শুয়ে, রক্তক্ষরণের জন্য অসুস্থ বোধ করে বোকার, সে ভাবে—'যত সব—', তারপর বুঝ্‌তে পারে সবাই মিলে ওকে টানা-হ্যাঁচড়া করে তুলছে। বোকার ভাবে সহসা এমন দুর্বল হয়ে পড়ল, এ এক বিশ্রী ব্যাপার। ওরা সবাই মিলে ওকে পুঁটুলির মত জড়ো করে বাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। বোকার ওদের গাল পাড়তে থাকে, আর ওদের ভিতর থেকে একজন বলে ওঠে—'হা ভগবান! লোকটা রীতিমত একটা জোয়ান মদ্দ বটে।'

পিছনদিককার এক লিন-টু-র মেঝেতে ওকে সবাই মিলে শুইয়ে রাখ্‌লো। একপাশে হরেক রকমের ভেয়ো-ঢ্যাক্‌লা জিনিসপত্র পড়ে আছে। যেমন,

পুরাতন একটা মোটর টায়ার, ভাঙ্গা-চোরা কাঠের বাক্স, এনামেলের একটা প্রাচীন সাইন-বোর্ড—তার গায়ে কিসের ছাপ পড়েছে, যেন অন্য কোনো এক গ্রহের মানচিত্রের ছাপ, সেইসব জায়গায় সাইনবোর্ডের পেনট্ খসে গেছে। ধূলি-মলিন একটি খাটের পায়া—ইত্যাদি, তবু এই ছায়া-ঘেরা ছাদের নিচে কিছুটা শীতল মনে হচ্ছে। লীন-টুর একপাশে জড়ো করে রাখা মুরগীর নাদি আর ধুলোর বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসছে।

বাইরের প্রখর সূর্যালোকের ভিতর থেকে কয়েকটি কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। চাতালে দাঁড়িয়ে সবাই ওর বিষয় কথা বলাবলি করছে। বোকার চোখ মেলে তাকায়—নিজেরই দেহের দৈর্ঘটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকে। নগ্ন-ধূসর পায়ের বুড়ো আঙুল পার হয়ে কয়েকটি পা দেখা যাচ্ছে। মেয়ে এবং পুরুষের পা, সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ছিন্ন ট্রাউজার আর সুতো-ওঠা মোজা।

একটি পুরুষ কণ্ঠ বলছিল—'এটা কিন্তু নিছক কাপুরুষতা। এমন ভাবে পিছন থেকে ছুরি বসানো।'

'জা, কিন্তু একবার ভাবো দেখি, অপর সবারের ওপর লোকটা কি সব বিশ্রী কাণ্ডই না করেছে। আমি আগেই বলিনি ?'

বোকার মনে মনে ভাবে—'এসব হারামজাদের দল জাহান্নমে যাক—সবাই চুলোয় যাক।'

কে একজন করুণা করে ওর গায়ের উপর একটা ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে দিয়েছে। তাতে ঘাম আর ধুলোর গন্ধ। না কাচিয়ে বিছানায় ব্যবহৃত এই কম্বলটা ছেঁড়া। মাঝে মাঝে সুতো ওঠা, দাগ ধরা। মোটা মোটা নোঙরা আঙুল দিয়ে সে এই জীর্ণ কম্বলটা স্পর্শ করে। কম্বলটার বুনন কর্কশ ধরনের, যেখানে বেশী জীর্ণ সেইখানটা পাতলা এবং চক্‌চকে। এ ধরনের কম্বলে শোওয়া ওর অভ্যাস আছে।

বোকারকে তিনবার ছুরি মারা হয়েছে, প্রতিবারই পিছন থেকে। একটা আঘাত মাথায়, তারপর কাঁধের পাশে—আর একবার একেবারে ডান দিকে। রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আর ততটা বেদনা নেই। আগেও বোকার ছুরির আঘাত খেয়েছে, তবে স্বীকার করতে হবে এমন বিশ্রীভাবে নয়—মাঝে মাঝে যখন যন্ত্রণার বেগ আসে তখন বোকার এইসব ভাবে। ও বেটারা এর চেয়ে ভালো আর কি করবে! এইভাবে শুয়ে থাকে এমবুলান্সের প্রতীক্ষায়। ধীরে ধীরে রক্ত শুখিয়ে যাচ্ছে। তার পেটা তামার মত মুখের ওপর—বিশ্রী মাথার যন্ত্রণা, মাথা ধরেছে।

কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভেসে উঠ্‌ছে—অনেক দূরে হাসি-মস্‌করা করছে।

চাতালের এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে পায়ের শব্দ এবং বান্ডিল-করা কাপড়ের টুপি মাথায় একটা বাদামী মুখওলা মানুষ উঁকি মেরে দেখ্ছে।

'এখনও ভালো আছো ত' বোকার ?' এমবুল্যান্স এই এলো বলে।

'দূর হও' বোকারের কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে পড়েছে।

আরেকটি গলায় শোনা যায়—'ও বেটা ওর জন্য অনেক দিন ধরেই তক্কে-তক্কে ছিল—'

'হা। বোকার কিন্তু ছুরির ব্যাপারে তেমন পোক্ত নয়। চিরদিন হাত-ই চালিয়ে এসেছে।'

'আমার ধারণা, সেইটাই খারাপ হয়েছে—'

মরুক বেটারা সব। বোকার ভাবে। সে এখন বেশ ক্লান্তি বোধ করে। কঠিন নোঙরা আঙুলগুলি যেন জঙধরা লোহার আঁকড়া, কম্বলের ছেঁড়া-খোঁড়া অংশে ঘোরাঘুরি করে।···একটা কাদা-কাদা পীচঢালা প্রাঙ্গণ দিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—চারদিকে কাঁটাতারের শক্ত বেড়া দেওয়া বন্ধ জানালা সেদিকে তাকিয়ে আছে। কার্বোলিক বীজাণুনাশক পদার্থের গন্ধ ছড়ানো জায়গাটায়, পাহারাদার গার্ডের বেঁকানো আঙুলে ঝোলানো ভারী চাবির ঝন্-ঝনানি শোনা যায়।

ওরা একটা ঘরে গেল তার চারপাশের সেলফ্গুলির এখানে-ওখানে কম্বল জড়ো করে রাখা আছে। পাহারাদার বল্ল—'দুটো উঠিয়ে নাও কর্তা' আর বোকার সেই সব কম্বলের স্তূপের ভিতর থেকে ঘাঁটতে থাকে, ও সবচেয়ে মোটা এবং গরম একটা কম্বল খুঁজছে। কিন্তু পাহারাদার লোকটা, যার কুত্তা-কুত্তা মুখ আর মাথায় কাপড়ের জীর্ণ একটি টুপি, হেসে উঠে ওকে এক পাশে ঠেলে দেয়, কাছাকাছি যেমন পেল দুটো কম্বল উঠিয়ে নিয়ে বোকারের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেগুলি নোঙরা এবং দুর্গন্ধওলা, আর ভিতরে রণক্ষেত্রের অনিয়মিত সেনাবাহিনীর মতো থিক্ থিক্ করছে পোকার দল।

'চলে এসো, চলে এসো। তুমি কি মনে করো নষ্ট করার মত অঢেল সময় আমার ?'

বোকার বলে—'বড় ঠাণ্ডা—সাঙ্ঘাৎ।'

কিন্তু আসলে ও যে ঠিক পাহারাদার গার্ডের সঙ্গে কথা বলছে তা নয়। ওর নিজের বয়স ছ'বছর, আর ওর ভাই উইলি ওর চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। দুজনে মিলে একটা সঙ্কীর্ণ, দোমড়ানো ঝুলেপড়া যে বিছানাটি

দুজনে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করত, সেই বিছানায় বোকারের দেহ থেকে ভাই সুতির কম্বলটা টেনে নিচ্ছে। বাইরে কার্ড-বোর্ড ঢাকা জানালার ওপর বৃষ্টির জলের আওয়াজ, আর হেঁপো বুড়োর মত ফাঁক-ফোঁক দিয়ে হাওয়া ঢুকে আওয়াজ করছে।

'না, এই উইলি, কি করছিস, সব কম্বলটাই টেনে নিয়েছিস নিজের দিকে।'

'আরে আমি কি করব ভাই, কি ঠাণ্ডা দেখ্‌ছিস না।'

বোকার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলে—'আমার কথাটা ভাব, আমারও ত' শীত লাগছে ভাই।'

একটা কম্বলের নিচে দুটুকরো চৌকা-কাঠের ধাঁধার অংশের মত জড়ামড়ি করে পড়ে আছে দুজনে···স্ত্রীলোকটি শ্রান্ত কেশপাশ ওর মুখে প্রবেশ করেছে আর তাতে বাসি কেশরঞ্জনীর গন্ধ। দুটি মাথার কালো ছাপ পড়েছে শ্বেত-ধূসর বালিসের ওপর—আর প্রায় সেরে-যাওয়া ক্ষতের মত লিপষ্টিকের দাগ।

স্ত্রীলোকটি আধো-ঘুমে জড়ানো গলায় বল্‌ছে—'দেখো! দেখো! আমি তোমাকে বলিনি? কি বলেছিলাম?' ওর দেহ আর্দ্র, কম্বলের নিচে থাকায় ঘাম-ঘাম ভিজে-ভিজে; আর ঐ কম্বল আর বিছানায় সস্তা সুগন্ধি দ্রব্য, ছড়ানো পাউডার, প্রস্রাব আর মুরগীর নাদির দুর্গন্ধে ভরা। বিবর্ণ পরদা বাইরের উষ্ণ হাওয়ার পানে হাতছানি দেয়। স্ত্রীলোকটি কম্বলের নিচে ওর দিক থেকে সরে যায়, বিড় বিড় করতে থাকে, আর বোকার উঠে বসে। বিছানার স্প্রীং-এর আতংকিত শব্দ টিনের বাথটবে শায়িত শিশুর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। ছেলেটার কাংস বিনিন্দিত কণ্ঠের ক্রন্দনের সুর ক্রমশ উচ্চতর তালে চড়ে যায়—উচ্চ থেকে উচ্চতর···

এই কান্না যখন একটা চরম পরিণতির দিকে চলেছে তখন বোকারের ঘুম ভেঙ্গে যায়—কান্নাটা হঠাৎ দ্রুততালে ভেসে যায়, যেন সাইরেনের সুইচ সহসা বন্ধ করা হল। চাতালের ওপর সূর্যালোকে সমবেত কণ্ঠস্বর সে ভাবেই উত্তেজিত ভঙ্গীতে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি শাদা কোটের প্রান্তদেশ বোকারের নজরে পড়ে। আর তার পরই এ্যামবুলান্সের লোকজন লীন-টুর ভিতর এসে পৌঁছায়। ওর মাথায় বিশ্রী যন্ত্রণা, তার দেহের ক্ষতস্থানগুলি দব-দব করছে। নিঙড়ানো গামছার মত ওর মুখটা ঘামতে থাকে।

ওর দেহের ওপর কয়েকটি হাতের তল্লাসি চলে। একজন এ্যামবুল্যান্স চালক প্রশ্ন করে—'কোনো বেদনানুভব করছেন নাকি?'

বোকার তার ওপর ঝুঁকে-পড়া শ্বেত-গোলাপী মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে—'নো স্যার।'

যে সব পুরাতন খবরের কাগজের ওপর ও এতক্ষণ শায়িত ছিল সেগুলিতে রক্তে ভিজে গেছে। একজন সহকারী বলে—'ছুরির আঘাত।' অন্যজন বল্‌ল—'বাইরে তেমন রক্ত ঝরছে না।' 'ওর গায়ে কয়েকটা প্রেসার প্যাড চাপিয়ে দাও।'

বোকার এখন শূন্যে দোদুল্যমান—স্ট্রেচারবাহিত, চারপাশে মজা দেখার লোকের মিছিল। ওর পিছনের রবার নির্মিত আস্তরণটির জন্য পিঠটা শীত-শীত করছে। স্ট্রেচার এ্যামবুল্যান্সের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দরজাটা সজোরে বন্ধ করা হল। দর্শকগণের চোখ থেকে একেবারে চাপা পড়ে গেল। তারপর সাইরেন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে সোচ্চার হয়ে ওঠে। জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে পথ পরিষ্কার করে নেয়।

এমবুল্যান্স ছুটে চলতে বোকার তার দেহে সেই তরঙ্গ অনুভব করে। তার খুনে আঙুল বেডিং-এর মোড়া প্রান্তগুলি স্পর্শ করে। ওর দেহের ওপরকার আচ্ছাদনটি যেন কোকেনের মত শাদা। এবং কম্বলটি বেশ পুরু। নতুন এবং গরম। বোকার চুপ করে শুয়ে-শুয়ে সাইরেন শুনতে থাকে।

[Blankets] অনুবাদ : ভবানী মুখোপাধ্যায়

কফি

অ্যালেক্স্ লা গুমা

ওরা ভুট্টাক্ষেত পেরিয়ে গেল। গাড়িটা চালাচ্ছিল ওরা মস্ত নিচু, মরুভূমির মত জায়গার মাঝ দিয়ে। চারপাশে এলোমেলো হয়ে ছড়ানো সমতল আর নিচু জমি। জমিটা দক্ষিণে ঢালু। কাঁটা ঝোপে ভর্তি। যেন মস্ত এক আছাঁটা কার্পেট। দক্ষিণে অনেকটা এগিয়ে গেলে দেখা গেল একটা উইণ্ডমিলের পাম্পের লোহার পাত সকালের হাল্কা বাতাসে খুব ক্লান্তি ভরে ঘুরছে। মনে হলো, এখনি জেগে উঠে কৃপণ পৃথিবীর কাছ থেকে জল টানার কাজ খুব অনিচ্ছাভরে শুরু করেছে। গাড়িটা পিচের রাস্তায় গড় গড় করে চলছিল। কালো পথের ওপরে চাকার শব্দ উঠছিল জোরে।

জায়েদা বলে উঠল, 'আমাকে আর একটা স্যাণ্ডউইচ দাও।' পেছনে সুটকেস রাখার জায়গায় সে গুটিসুটি হয়ে বসেছিল। ছ' বছর বয়স। এতটা পথ এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এখন চারদিকের দৃশ্য দেখার আগ্রহ উঠে গেছে। এজন্যে ক্লান্ত হয়ে ঐ জায়গাটায় হেলান দিয়ে বসেছে। চারপাশে শুকনো খাল বিল। পোড়-খাওয়া গাছপালা সব শব্দ করে সরে যাচ্ছে। সে সব মোটেই সে দেখছিল না।

'টিনে কয়েকটা আছে, তুমি তো নিজেই নিতে পার। পার না?' যে মহিলাটি গাড়ি চালাচ্ছিল সে রাস্তার ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'রে, আর কিছু খাবে?' তার পাশে বসা ছেলেটি বলল' তার ক্ষিদে নেই। খোলা জানলার বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়ানো কাঁটাতারের বেড়ার দিকে স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল। 'মা, কেপটাউন কত দূরে?' জায়েদা স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞাসা করল।

মহিলা বলল—'কাল বিকেলে পৌঁছব।'

'বাবা থাকবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

রে বলে উঠল—'কয়েকটা ভেড়া।' ছড়ানো খামার বাড়িগুলো পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল গাড়িটা। বাদামী ঢালু জমিতে বৈচিত্র্যহীন ঢিলেঢালা গড়নের সব বাড়ি—সে সবও পেরিয়ে গেল তারা। মা সারারাত গাড়ি চালিয়েছে। এখন সে ক্লান্ত। চোখ দুটো তার লাল। চোখের পাতায় বালি করকর করছে, চোখের তারায় তা লাগছে। আগের রাতে রাস্তার ধারে অল্প সময়ের জন্য থেমেছিল। একটা ছোট শহরের বাইরে, রাস্তা থেকে দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়িটা রেখেছিল। রাতে থাকার কোন জায়গা মেলেনি। হোটেলগুলো শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য। এই সব শহরে শুধু শ্বেতাঙ্গরাই থাকে। চাকররা ছাড়া বাকী সবাই অনেক দূরে ভাঙ্গা মাটির বাড়িতে থাকে। তারা এদিকে কাউকে চেনে না।

সকাল হতেই হতাশা, বিষাদ, মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল। ছেলে মেয়েদের সামনে সে এটা সামলাবার চেষ্টা করছে। মাঝরাত পর্যন্ত গাড়িটা রাস্তার ঐদিকে রেখে সে আবার যাত্রা শুরু করেছিল। ছেলেগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে, সে সারারাত গাড়ি চালিয়েছে।

এখন তার খুব মাথাও ধরেছে। জায়েদা যখন জিজ্ঞাসা করল—'মা, আমি কি একটা মাংসের টুকরো নেব?' সে বিরক্ত হয়ে রুক্ষভাবে উত্তর দিল—'ওঃ! তাড়াতাড়ি কর। সবই ওখানে আছে। যাও, পার না যেতে?'

পেছনে গোটানো ফিল্মের মত চারপাশের দৃশ্য দ্রুত সরে যাচ্ছে। এখানে ওখানে লালচে-বাদামী, হলদে-লাল, গোলাপী-লাল সব ঝোপঝাড়। ভাঙ্গা নুড়ি পাথর। পুবদিকে শুকনো মাটি থেকে হঠাৎ এক মস্ত পাথরের সারি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যেন এক মস্ত লালচে ল্যাভেণ্ডার দেওয়া কেকের ওপরটা চকোলেট রঙের নুড়ি দিয়ে সাজানো। গাড়িটা পাথুরে রাস্তা দিয়ে চলছে। পেছনে লাল ধুলো উড়ে আগুন লাগা ধোঁয়ার পর্দার মত মনে হচ্ছে। একটা লেজঝোলা পাখি পেছনে উড়ছিল। রাস্তার ধার দিয়ে আস্তে আস্তে ঝোপের ওপরে উঠে গাড়ির মত দ্রুত গতিতে পাখা মেলে দিল সে।

'মা, মজার পাখিটা দেখ।' ধুলোয় ভরা কাঁচে তার গাল চেপে রে চিৎকার করে বলল। মা তার কথায় কান দিল না। হুইলের পেছনে একটু গা ছেড়ে দিল সে, আপনা থেকে তার পা নড়ছিল, কিন্তু বেশ ভাল ভাবেই নিচের প্যাডেল চালাচ্ছিল। সে ভাবছে, ট্রেন ধরলেই ভাল হতো। কিন্তু চিঠি লিখেছে গাড়িটা তার দরকার, অনেক জায়গায় তাকে যেতে

হবে। আশা করছে, কেপে তার ব্যবসাটা ভাল হবে। মায়ের মাথা ব্যথা করছে, না দেখেই সে চালাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারে রাস্তাটা শেষ করতে চাইছে।

রে বলল—'আমি একটু কফি নেব।' ড্যাশবোর্ডের নিচে র‍্যাক থেকে থার্মস্‌ফ্লাস্কটা নিল। সে এসব নিজে নিজেই করতে পারে, কাউকে করে দিতে হয় না।

সুটকেশগুলোর মাঝখানে বসে পেছন থেকে জায়েদা বলে উঠল—'আমাকেও একটু দাও।'

'লোভী হবে না' রে তাকে বলল —'কেবল খাচ্ছ, খাচ্ছ আর খাচ্ছ।'

'আমি মোটেই লোভী নই, একটু কফি চাই শুধু।'

'তুমি সকালে কফি নিয়েছ।'

'আমি আর একটু নেব।'

'লোভী, লোভী।'

মা ক্লান্তভাবে বলল—'তোরা তর্ক থামা তো।'

জায়েদা বলল—'ওই তো আগে আরম্ভ করেছে।'

মা তাকে ধমক দিল—'থাম, থাম বলছি।'

রে থার্মসের ঢাকাটা খুলছে। যখন খোলা হল কর্কটা তুলে ভেতরে তাকিয়ে বলল—'ও মা! একটুও নেই! একটুও কফি নেই!'

মা বলল—'খুব খারাপ হল এটা।'

জায়েদা চিৎকার করে বলে উঠল—'আমি একটু কফি নেব, আমার তেষ্টা পেয়েছে। আমার কফি চাই-ই।"

মা ক্লান্তভাবে বললেন—'বেশ। বেশ। একটু অপেক্ষা করো। সামনে এগিয়ে পথেই আমরা পেয়ে যাব। কিন্তু চেঁচামেচি তোরা থামাবি?'

ওপরে ছড়ানো নীল আকাশে তামার মত সূর্য চারপাশটা রোদ্দুরে একটা মস্ত বড় টোস্টের মত হলদে আর বাদামী হয়ে আছে। সব যেন অস্পষ্ট হয়ে কাঁপছে। মেয়েটি গাড়ি চালাতে লাগল, ক্লান্তভাবে, তার সমস্ত ভেতরটা যেন একটা শুকনো বাদামের মত এদিক ওদিক নড়াচড়া করছে। সানগ্লাসের ভেতরেও তার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। তার কালো, সুশ্রী ইণ্ডিয়ান মুখে একটা সরল ভাব। সমস্ত শরীরটা বেহালার বাঁধা তারের মত টান হয়ে আছে। এত টান যেন একটু ছুঁলেই ছিঁড়ে যাবে।

মাইলের পর মাইল শব্দ করে দ্রুত সরে যাচ্ছে—সমতল, ধূসর উঁচু টিলা, পোড়া মাটির ডাঙ্গা, আর নিচু পাহাড়ের মালা। একটা গড়ানে

পাহাড়ের পাথুরে জমির ওপর এক রাখালের কুঁড়ে হারানো মানুষের মত একা ঝুলে আছে। কখনও কখনও একটা গাড়ি উল্টোদিকে যাচ্ছে, উত্তরে কখনও কখনও এরোপ্লেনের প্রচণ্ড শব্দে চারদিক কেঁপে উঠছে। সূর্যের ঝলসানি এমনভাবে বেড়ে যাচ্ছে যেন বাতাস ফুটছে।

জায়েদা অস্থির হয়ে বলল—'আমি একটু কফি নেব। আমি একটুও কফি খাইনি।'

মা বলল—'আমরা কফি কিনব। কাফে দেখতে পেলেই আমরা কফি কিনে নেব। এখন চুপ কর। আর একটা স্যাণ্ডউইচ খাও।'

'স্যাণ্ডউইচ চাই না। কফি চাই।'

রাস্তার ধারে একটা গর্তের মধ্যে ভাঙা তিনকোণা জিনিসের মত ছড়ানো অনেকগুলো নড়বড়ে কুঁড়ে তাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। একদল উলঙ্গ, ধুলোমাখা, বাদামী ছেলেমেয়ে ভেড়ার খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে দৌড়ে রাস্তায় এল, গাড়িটা দেখে খুসি হয়ে হাত নেড়ে দিল। রে-ও হাত নাড়ল, হাসল, তারপর তারা চোখের আড়ালে চলে গেল। বায়ুচালিত জলের পাম্পের ধাতুদণ্ডটা এগিয়ে এল, অদৃশ্যও হল। ছেঁড়া, ধুলোমাখা, কম্বলে ঢাকা, এই গরমেও মাথায় ছেঁড়া ফেল্ট টুপি পরা তিনজন কালো মানুষ সামনে অজানা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এক লাইনে হাঁটছিল। গাড়িটা যখন তাদের ছাড়িয়ে দ্রুত চলে গেল তারা হাত নাড়ল না। কোন স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে হেঁটে চলল।

একটা স্টীলের ঝোলানো ব্রীজের জন্য গাড়ি গতি কমিয়ে দিল। একটা শুকনো পাথর ছড়ানো নদীর মধ্য দিয়ে শব্দ করে চলল। লোমগুলো ধুলোয় কালো হয়ে গেছে এরকম কয়েকটা ভেড়া নুড়ি পাথরগুলো শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছে। কাকতাড়ুয়ার মত একটা লোক তাদের দেখাশোনা করছে।

একটু পরে তারা কৃষ্ণাঙ্গদের থাকার জায়গা, আফ্রিকানদের থাকার জায়গা, মাটির ঘর পার হয়ে এল। রঙচটা পাশার ঘুঁটির মত পাহাড়ের বাদামী ঢালে ফাঁদ পাতা আছে। ছোট ছোট মানুষ, পিঁপড়ের মত কুকুর সেগুলোর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। আর একটা ঢালে রঙ-করা নুড়িপাথরে শহরের নামটা লেখা আছে।

গাড়িটা একটা রেলওয়ে সাইডিং-এর ছাউনি পার হল। ভেড়াগুলো খোঁয়ারে ভরা হচ্ছিল। তারপর গাড়িটা ক্রশিং-এর কাছে একদিকে হেলে হঠাৎ রাস্তায় উঠে পড়ল। একজন কালো লোক সাইকেলে চলে গেল। অনেকগুলো দোকান পেরিয়ে একটা রেলওয়ে হোটেলের বাদামী রঙের সামনের দিকটায় গাড়িটা আস্তে ঢোকাল। হোটেলটা দেখে সহজে বোঝা

যায় না কোন্ শ্রেণীর। একটা শুকনো ঝোপের ওদিকে আর একটা হোটেলে ডাচ কলোনী যুগের সামনে খোলা প্রবেশ পথে একদল লাল রোদে-পোড়া শ্বেতাঙ্গ মুখে বাতাসের ধাক্কা লাগিয়ে টেবিলে বসে মদ খাচ্ছিল। ছোট শহরের ধুলোভরা পাথুরে রাস্তায় অন্য গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। ধুলোভরা গাড়িগুলো, বিধ্বস্ত পিক-আপ ট্রাক। ভুসিখোলের দোকানের সামনে একটা ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। একজন বুড়ো কালো লোক দোকানের সামনের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে, তার ঘাসের ঝাঁটায় বাতাসে হিস-হিস শব্দ হচ্ছে।

গোলাপী মুখ, হলুদ চুল, খাকী শার্টপ্যান্ট পরা দুজন শ্বেতাঙ্গ যুবক গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ তাদের চোখে শত্রুতা এসে গেল যখন তারা দেখল একজন কালো মেয়ে রাস্তার ধুলোয় পাতলা পর্দার নিচে নতুন ঝকঝকে মসৃণ একটা গাড়ি চালাচ্ছে। লাল নুড়ির পথে চলতে গিয়ে গাড়িটা একটু ধোঁয়া ছাড়ল।

রে জিজ্ঞাসা করল, 'জায়গাটার নাম কি, মা ?'

মা বলল, 'আমি জানি না।' সে খুব ক্লান্ত, কিন্তু গাড়িটার গতি কমিয়ে খুশি হল। বলল—'কারোর কোন জায়গা হবে।'

জায়েদা জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলল—'লোকটা কি করছে ?'

রে চারদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কোথায়, কোন লোকটা ?'

ছোট মেয়ে বলল—'সে এখন চলে গেছে। তুমি তাড়াতাড়ি দেখলে না। এখন কি আমরা কফি পাব ?'

মা বলল—'মনে হচ্ছে, পাব। তোমরা ভালভাবে থাক, তাহলে কফি পাবে ঠাণ্ডা কিছু খেতে চাও ?'

ছেলে বলল—'না। তাহলে পরে আবার তেষ্টা পাবে।'

জায়েদা বলল—'আমার অনেকটা চিনি দিয়ে অনেকটা কফি চাই।'

মা উত্তর দিল—'বেশ, তাহলে এত কথা বলা থামাও।'

খানিকটা এগিয়ে ফাঁকা জায়গাটার শেষে একটা কাফে। বাইরের রাস্তায় জানলার সামনে স্টীল টিউবের টেবিল চেয়ার পাতা ছিল। সামনেটায় পুরনো কোকাকোলার ছবি আর রঙ করে লেখা মেনু দিয়ে সাজানো। ফাঁকা জায়গার দিকে যে দেওয়াল সেখানে এক বর্গফুট মত গর্ত দিয়ে অশ্বেতাঙ্গদের দেওয়া হয়। একদল ছেঁড়া কাপড় পরা কালো আফ্রিকান লোক ধুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। গর্তটার মধ্যে সবাই একসঙ্গে দেখতে চেষ্টা করছে। তারা খুব কষ্ট করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে।

মা গাড়িটা চালিয়ে ওপরে নিয়ে এল ও কাফের সামনে থামল। ভেতরে

একটা রেডিও বাজছে। জানলার ভেনেশিয়ান পর্দার পাতগুলো একেবারে পরিষ্কার ঝকঝকে।

'আমাকে ফ্লাস্কটা দাও।' মা ছেলের কাছ থেকে থার্মসফ্লাস্কটা নিয়ে দরজা খুলল।

'তোমরা চুপ করে বস। আমার দেরী হবে না।'

দরজাটা খুলে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত বাইরে দাঁড়িয়ে পেশীগুলো আলগা করায় ভারি আরাম হল। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ছড়ানো শরীর থেকে প্রায় ইন্দ্রিয়সুখ পেল। কিন্তু মাথাটা এখনও যন্ত্রণা করছে আর সেটাই তার মুহূর্ত অনুভব করা আনন্দটা নষ্ট করে দিল। সেই অনুভূতিটা চলে গেলে মাথাটা আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল। শরীরটা আবার শক্ত হয়ে গেল। স্মার্ট ট্যান সুটের ভাঁজগুলো সে ঠিক করে নিল। কিন্তু জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলে ফেলল। তারপর থার্মসফ্লাস্কটা নিয়ে প্ল্যাস্টিক আর স্টীল ফার্নিচারের পাশ দিয়ে কাফের মধ্যে ঢুকল।

কাফের ভেতরটা ঠাণ্ডা। কাচের শো-কেসে ক্যানগুলো আর সব প্যাকেট মিউজিয়ামের মত সাজানো। জায়গাটার পেছনে কোথা থেকে আলু ভাজার শব্দ ও গন্ধ আসছে। শেলফে একটা ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে আর পেছনের দেয়ালের গায়ে দুটো ঝকঝকে পাত্রে, একটায় চা আর একটায় কফির জল ফুটছে।

অন্য আর একজনমাত্র খরিদ্দার একটি ছোট শ্বেতাঙ্গ বালক, মাথায় দুরঙের চুল প্রায় পাকা আপেলের মত মুখ আর মস্ত নাক। একটা কাচা ছাপা শার্ট, খাকি প্যান্ট পরণে। তার হলদে শাদা রঙের খালি পা ধুলোমাখা আর কালো-কালো কড়াতে ভরা। গোলাপী চটচটে মুখে ললিপপ খাচ্ছে আর একটা তারের র‍্যাকে রাখা পুরনো ম্যাগাজিন উল্টোচ্ছে।

কাঁচের কাউন্টারের পেছনে সোডা ফাউন্টেনের তিন সারি পরে একজন চওড়া, ভারী মহিলা সবুজ শেমিজ পরে হিসাবের খাতা দেখছে। পাশের দেওয়ালে যে কালো মুখের দল চৌকো গর্ত ঘিরে রয়েছে তাদের পুরোপুরি অবজ্ঞা করছে। তার কাঁধ গোল, শরীর ভারী, মুখ লালচে, মনে হচ্ছে তার মুখে যেন বালির ঝাপটা লেগেছে। শক্ত চওড়া গাল, চোয়াল শক্ত, নাক ভারী, দুটো নিষ্প্রাণ ধূসর চোখ। মুখে একটা গভীর ক্ষত, ঠাণ্ডা টিকটিকির মত অপকারী, শুকনো খসখসে, করাতের মত কাটা জায়গাটা।

সে তাকিয়ে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঐ মেয়েটির রঙ দেখতে পেয়ে কথা বলার সময় মনে হল ধূসর গর্ত থেকে তার চোখ দুটো বেরিয়ে

পড়বে। একটা পোকার মত মেয়েটির হালকা গোলাপী তারুণ্য যেন গুটিয়ে গেল। মেয়েটি যেন কথা খুঁজতে লাগল।

'দয়া করে আমার এই ফ্লাস্কটায় কফি ভরে দিতে পারবেন?' মা জিজ্ঞাসা করল।

মুখের ফাটলটা খুলে গেল। ভেতর থেকে একটা কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল—পাথরের ধাতু ঘষলে যেমন শব্দ হয় তেমনি কর্কশ—'কফি? প্রভু যীশু!' গলার স্বরটা পেঁচার মত হল—'একটা বিচ্ছিরি কুলি মেয়ে ভেতরে এসেছে।' বাদামী, ক্লান্ত, সুশ্রী ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে স্মার্ট সানগ্লাস আর শহরের কাটের ট্যান সুটে দেখতে পেয়ে তার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। 'কুলি, কাফের, হটেণ্টটরা বাইরে থাকবে।' সে চেঁচিয়ে উঠল। 'হতভাগী জানিস না, আবার ইংরাজীও বলছে! এঁ্যা!'

মা তার দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইল। অবাক হয়ে গেল। তারপর তার ভেতরে কোথাও কিছু ঘটল। শক্ত করে বাঁধা তারের মধ্যে আঘাত পড়ল। হঠাৎ আলগা হয়ে ঝনঝন করে উঠল। তীব্র ঘৃণায় সে চিৎকার করে উঠল আর হাত থেকে থার্মসফ্লাস্কটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দিল। 'রক্ত চোষা শাদা জঞ্জাল,' সে চিৎকার করে উঠল, 'তুমি নিজে কুলি।' মেয়েটি কাউণ্টারের পেছনে সরে যাবার আগেই ফ্লাস্কটা ছুটে গিয়ে তার কপালে ভুরুর ওপরে আঘাত করল, তারপর ছিটকে বেরিয়ে গেল। ঝনঝন করে শব্দ হল, ভেতরের পাতলা কাঁচটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কাউণ্টারের পেছনের মেয়েটি কুৎসিত ভাষায় কেঁদে উঠল, চোখের ওপরে রক্ত-পড়া কাটা জায়গাটায় একটা হাত ঢাকা দিল। ভয়ে পেছনে সরে গেল। ছোট ছেলেটাও ভয়ে চিৎকার করে ললিপপটা ফেলে ছুটে পালিয়ে গেল। চৌকো ফাঁকটায় কালো মুখগুলো উত্তেজনায় হাঁসফাঁস করতে লাগল।

সে পাশের রাস্তাটা পেরিয়ে এল। তার বাদামী মুখ রাগে শক্ত হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর জোরে তার গাড়ির দরজাটা খুলল। অশ্বেতাঙ্গের দল দেওয়ালের গর্ত ছেড়ে ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। সে গাড়ির দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে স্টার্ট দিল।

জায়গাটা থেকে বেরিয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। স্টীয়ারিং শক্ত করে ধরে থাকল, হাতের হলুদ গাঁটগুলো বাদামী চামড়ার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। ক্রমশ সে আত্মস্থ হল। ক্লান্তভাবে নিজেকে ছেড়ে দিল, গাড়ির গতি কমাল, রাগের জন্য শরীর ভয়ানক অবসন্ন লাগছে। শহর

ছেড়ে যাবার সময় ছেলেমেয়েরা তাকে লক্ষ্য করছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে খারাপ কিছু ঘটেছে।

ছেলে রে জিজ্ঞাসা করল—'কফি নেই ? মা, ফ্লাস্কটা কোথায় ?'

'না, ওখানে কফি নেই,' মা উত্তর দিল, 'কফি ছাড়াই যেতে হবে মনে হচ্ছে।'

জায়েদা অভিযোগ করল—'আমি কফি চেয়েছিলাম।'

মা বলল—'তুমি একটু ভাল হয়ে থাক। মা ক্লান্ত। দয়া করে কথা বলা থামাও।'

রে আবার জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কি ফ্লাস্কটা হারিয়েছ ?'

'চুপ কর, চুপ কর,' মেয়ে তাকে বলল, আর তারপর তারা একেবারে চুপ করে গেল।

শহরের শেষ প্রান্ত পেরিয়ে গেল। একটা ধুলো মাখা সার্ভিস স্টেশনে লাল পাইপগুলো প্রহরীর মত দাঁড়িয়েছিল। সেটা চলে গেল। জ্বালানী কাঠের মস্ত বোঝা মাথায় একটা মানুষ চলে গেল, চলে গেল শহরের শেষ বাড়িটাও, চুণকাম করা কতগুলো ঘর, দরজায় মুরগী মাটি আঁচড়াচ্ছে। ভেড়ার লোম ছাঁটার পুরনো ছাউনি, ভেতরে ময়লা উলের স্তূপ, একটা লোক বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে তাদের যাওয়া লক্ষ্য করল।

রাস্তাটা আবার হলুদ-লাল-বাদামী জায়গার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। শেষ সবুজ গাছগুলোও কমে এসেছে। মধ্য দিনে প্রেতের মত সূর্য নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিচে নির্বিকার পৃথিবী। গাড়ির চাকাগুলো কালো রাস্তায় মৃদু শব্দে এগিয়ে চলেছে। সামনে কয়েকটা গাড়ি আছে, কিন্তু মেয়েটি সেগুলোর আগে যাবার কোন চেষ্টাই করল না।

ছেলে রে গাড়ীর নীরবতা ভঙ্গ করল—'বাবা কি আমাদের নিতে আসবেন ?'

জায়েদা বলল—'আমি জানি। আসবেন। আইক কাকার গাড়ির চেয়ে এই গাড়িটা আমার বেশি ভাল লাগে।'

রে বলল—'কিন্তু আইক কাকা আমাদের অনেকবার গাড়ি চড়িয়েছেন, ঐ যে আবার সেই মজার পাখিটা যাচ্ছে।'

জায়েদা বলল—'মা, আমরা কি পরে একটু কফি পাব ?'

মা উত্তর দিল—'বাছা, পেতে পারি। দেখব পাই কি না।'

গাড়ির জানলার দুপাশ দিয়ে শুকনো ধুলোর দৃশ্যগুলো তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। একটু আগে রাস্তার এই অল্প ট্রাফিকও গতি কমিয়ে দিচ্ছে। মা তার পা-টা একসিলেরটারে দিয়ে রাখল।

রে চীৎকার করে উঠল, 'পাহাড়টা দেখ। মুখের মত লাগছে।'

জায়েদা উঁকি দিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি সত্যি মুখ?'

রে বলল, 'বোকার মত কথা বল না। এটা সত্যি মুখ কি করে হবে? মুখের মত দেখতে লাগছে।'

গাড়িটা থেমে গেল। মা গাড়ির জানলা দিয়ে মাথাটা বের করে সামনে ঝুঁকে দেখল, ওদিকে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে আছে।

একটা ছোট দাঙ্গার গাড়ি (Riot van) আর একটা ল্যাণ্ড রোভার। জানলাগুলো আর স্পট লাইট ঘন জাল দিয়ে ঘেরা। রাস্তার মাঝামাঝি গাড়িগুলো এনে রাখা হয়েছে। আর একটা ধুলোমাখা গাড়ি তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে। এটা ঐ দুটো গাড়ির মধ্যে একটা বাধা তৈরি করে রেখেছে। মাঝখানে আর মাত্র একটা গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। খাকি সার্ট, ট্রাউজার আর চাপা টুপি পরা একজন পুলিশ ঐ গাড়িটার সামনের রডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার দু পায়ের মধ্যে একটা স্টেনগান। খাকি পোশাক পরা আর একটা লোক স্টীয়ারিং-এ আছে। অন্য একজন ঐ ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ড্রাইভারদের পরীক্ষা করার পর ট্রাফিক নির্দেশ করছে। সামনের গাড়িটা ফাঁকা জায়গাটার কাছে থেমে গেল। ড্রাইভার বেরিয়ে এল। পুলিশ দেখল। তারপর পিছিয়ে গিয়ে তাকে যেতে দিল। গাড়িটা সঙ্কেত দিয়ে চলে গেল।

পরের গাড়িটার দিকে পুলিশ এগিয়ে গেল। একটা হাত তুলল। গাড়ি চালাতে চালাতে মা শুনতে পেল তার হৃৎপিণ্ড হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছে। সে ব্রেক কষে অপেক্ষা করতে লাগল। খাকি পোশাক পরা লোকটাকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল।

লোকটার মুখে কমবয়সীর ছাপ। গায়ের রঙ এখানকার স্বাভাবিক লালচে পোড়া। মাথার টুপির সামনেটা চামড়ার, ঝকঝক করছে। অল্প অল্প হাসছিল। কিন্তু তার হাসি চোখে পৌঁছায় নি। সে চোখে গ্রানিট পাথরের টুকরোর মত একটা কাঠিন্য ছিল। তার কোমরে চামড়ার খাপে ভরা একটা পিস্তল। এগিয়ে এসে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একেই তার মত লাগছে।'

স্টেনগান নিয়ে লোকটা সোজা হয়ে উঠল। কিন্তু এগিয়ে এল না। গাড়ির ভেতরে তার সঙ্গী মেয়েটিকে তাকিয়ে দেখল।

রাস্তার পুলিশটি তখনও একটু হেসে বলল, 'আঃ! আমরা তোমার

জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি কি ভাবনি যে তারা আগেই ফোন করে রেখেছে এ্যাঁ?'

গাড়ির ভেতরে ছেলেমেয়েরা মড়ার মত স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একদৃষ্টিতে দেখে দেখে তাদের চোখ ব্যথা করছে। মা বাইরে তাকিয়ে বলল, 'এসব কি হচ্ছে?'

'কিছু মনে কর না এসবের জন্য।' পুলিশটি তাকে বলল, 'তুমি জান এসব কি?' সে তার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'এই তো কালো মেয়ে, ব্রাউন স্যুট, সানগ্লাস। তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।'

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি?' তার গলার স্বরে উদ্বেগ নেই। কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তিত হল।

'কিছু মনে কর না, তুমি বুঝতে পারবে।' পুলিশটি ঠাণ্ডা গলায় তাকে বলল, 'এই সব আন্দোলনকারীদের একজন এখানে গোলমাল করছে। বেশ, শোন।' সে তার দিকে কঠিন চোখে বলল, 'তুমি গাড়িটা ঘোরাও। কিছু করার চেষ্টা করো না। বুঝলে? আমাদের গাড়িটা সামনে থাকবে। ভ্যানটা পেছনে। দেখ।' তার গলার স্বর ঠাণ্ডা, ভীতিজনক।

'আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? আমাকে আমার ছেলেমেয়েদের কেপ-টাউনে পৌঁছে দিতে হবে।'

সে বলল, 'তা আমি জানি না। তুমি এখানে গোলমাল করেছ। তার দাম তোমাকেই দিতে হবে।' সে পুলিশের গাড়ির দিকে পেছন ফিরে তাকাল ও একটা হাত নেড়ে দিল। পুলিশের গাড়ির ড্রাইভার স্টার্ট দিল ও পেছনে এল। তারপর রাস্তায় নেমে পড়ল।

'তুমি ঐ মোটর গাড়িটা অনুসরণ কর।' পুলিশটি বলল, 'আমরা এই পথ ধরে ফিরে যাচ্ছি।'

মেয়েটি কিছুই বলল না, গাড়ি স্টার্ট দিল, পুলিশের গাড়ির পেছনে গাড়িটাকে নিয়ে এল।

'তুমি এখন অন্য কিছু করার চেষ্টা করবে না,' পুলিশটি আবার বলল। সে তার দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি এখন ঠাণ্ডা। পুলিশটি দাঙ্গার গাড়িতে (Riot van) ফিরে গেল ও ভেতরে উঠল। মেয়েটির সামনের গাড়িটি স্পীড নিল, সে তার পেছনে চলল, তার পেছনে ট্রাকটা অনুসরণ করল।

জায়েদা জিজ্ঞাসা করল, 'মা আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

পুলিশের গাড়ির পেছনে চালাতে চালাতে মা বলল, 'চুপ করে লক্ষী হয়ে থাক।' চারপাশটা লালচে বাদামী, ধুলোয় ভরা। তারা এসব ছাড়িয়ে গেল। সামনের নীল আকাশ নাচছে, কাঁপছে। শুকনো ঝোপঝাড়ময় দৃশ্য তাদের চারদিক ছাড়িয়ে সূর্যের হলুদ ঝলসানিতে পৌঁছে গেল।

ছোট মেয়ে জায়েদা আবার বলল, 'আমার একটু কফি খেতে ইচ্ছে করছে।'

[Coffee for the Road] অনুবাদ : ইরা সরকার

স্যুটকেস

ইজিকিয়েল মাহাফেল

এরই মধ্যে একদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার সে করবেই। টিমি এই কথা ভাবছিল। সুযোগ পেলে আর সে ছাড়বে না। অনেকেই এমনি নগ্ন সুযোগের ব্যবহার করে বড়লোক হয়ে গিয়েছে। এমন কি আর হতে পারে না, যে তারও বরাতে ওমনি সুযোগ নাচছে।

গ্রীষ্মের বিকেলে সে ফুটপাতে বসেছিল। দিনটা ছিল নববর্ষের আগের দিন। এই ভীষণ গ্রীষ্মে টিমি একঘণ্টার ওপর বসেছিল। নাকের মধ্যে পোকা ঢুকে তার বার বার হাঁচি হচ্ছিল। চোখে জল ভরে আসছিল বলে রাস্তার লোকজন যেন নাচছে বলে মনে হচ্ছিল।

পরিস্থিতির বাস্তবতাটা একটা ঠাণ্ডা বেদনার মত পোকাগুলোর সঙ্গে মোকাবিলার মধ্যেও যেন ফিরে ফিরে আসছিল। আজকের দিনটা যেন সেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতেই গেল। কাজ পাওয়া যেতে পারে এমন তিন জায়গায় সে আজ ঘুরেছে। কোথাও কিছু হয় নি। এক জায়গায় তো আবার তাকে বললে, 'একজনকে তো আমাদের নেয়া হয়ে গিয়েছে।' আর এক জায়গায়, সেই ছোটখাটো টাইপিস্টটি তাকে বললে, 'জন তুমি বড্ড বড়। আমাদের মনিব একজন ছোট ছেলে খুঁজছেন; এই বছর আঠারো, এই রকম বয়সের আরকি।' এই বলে মেয়েটি আবার টাইপ করতে শুরু করল। ওর সাদা মুখখানা সিগারেটের ধোঁয়াতে ঢেকে গেল। আর তৃতীয় জায়গায় একজন হোঁৎকা সাদা লোক তার দামটাও বলে দিলে তার পিনপিনে গলায়। 'হপ্তায় আড়াই পাউণ্ড।' 'সাড়ে তিন,' টিমি বললে। 'নিতে হলে নাও, নয়তো যাও।' মনিব একেবারে পাকা কথা বলে দিলে! টিমি মোটকা লোকটির ফুলো ফুলো গাল, আর কুৎকুতে ছোট চোখগুলো দেখে মনে মনে হাসল।

বোলতা একটা পোকাকে ধরে পোকাটার উপর অত্যাচার করছিল। বোলতাটা পোকাটাকে গায়ের উপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করল। তারপর পোকাটির উপর চড়ে বসল। মাথা উঁচু করে পোকাটার গায়ে হুল ফোটাতে লাগল। পোকাটা ভীষণ কাঁপতে লাগল। যেন পালাবার চেষ্টাতেই। তার পর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। শিকার ধরা হল। পোকাটার জন্য টিমির দুঃখ হতে লাগল। এ অন্যায় অসম যুদ্ধ। এই রকমই কি হতে হয়? যার জোর বেশি সেই অত্যাচার করে মেরে ফেলবে যে দুর্বল তাকে? বোলতাটা পোকাটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ওর বাসাতে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ ওর মনে পড়ল, বাড়িতে নিয়ে যাবার মত কিছুই নেই ওর। ওর একটি সান্ত্বনা যে ওর স্ত্রী অবুঝ নয়। স্বাভাবিকভাবেই ও বলবে, 'কাল আবার সূর্য উঠবে। সূর্য সকলের জন্যেই ওঠে। কাল হয়তো কিছু হবে। আমি উনুনটা জ্বালি। বলে না, ঘরে দানা না থাকলেও আগুন জ্বালতে হয়।'

ওর এখন অসুখ। বাচ্চা হবার দেরি নেই। এটি তৃতীয়। গত দুমাস ধরে কোন উপার্জন নেই। সব পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে। কিছু একটা করতে হয়। জেলে যেতে হবে এমন কিছু অবশ্যই নয়। অবশ্য ছেলে, বউ সবাইকে নিয়ে জেলে যেতে পারলে মন্দ হত না।

তার পাশ দিয়ে সাদা চামড়ার লোক একজন চলে গেল। বেশ মাতাল। টিমির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে তাকাল। ব্রাণ্ডির বোতলটা টিমির দিকে বাড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না।

'এই যে জন, খাও। শুভ নববর্ষ।' টিমি মাথা নাড়ল।

'আরে ভয় কি বাওয়া। পুলিশ তোমাকে ধরবে? না···না···'

টিমি মাথা নেড়ে তার পথ ধরল।

'শালারা নববর্ষও করতে শেখে নি।'

বোতলটা নাড়াতে নাড়াতে ও চলে গেল।

সবই টাকার খেলা, টিমি ভাবলে।

তার মনে পড়ল, এখন বাড়ি যাবার সময়। সে সোফিয়া টাউনের একখানা বাস ধরল। বাসের আবহাওয়া যেন তার বিরুদ্ধে। কেমন উচ্ছৃঙ্খল মতন। শুভ নববর্ষ বলে সবাই যেন থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে।

তারই ঠিক উল্টো দিকে একজন গিটার বাজাচ্ছিল। টিমি তার দিকে তাকিয়েছিল। সামনের ফাঁকা জায়গাটায় এই বাজনার তালে তালে নাচছিল মেয়েটি। নিজের বাজনায় বাজিয়ে মুগ্ধ। সে গিটারটাকে নেড়েচেড়ে আদর করে যেন কুল পাচ্ছিল না। লম্বা আঙুলগুলো তার যেন বিনা পরিশ্রমে বাজিয়ে

যাচ্ছিল। মেয়েটা তার শরীরটাকে নাচাচ্ছিল যেন লোভ দেখাতে। মনে হয় যেন বাতাসে দুলছে একটা লতা। হাতকাটা জামার কাটা হাতের ফাঁকে স্তনের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। গিটারবাজিয়ে মাথাটা এমনভাবে গিটারের দিকে ঝোঁকাচ্ছিল মনে হয় যেন সে ওই গিটারের কোন গোপন কথা শুনতে পাচ্ছিল।

দুটি তরুণী টিমির পাশে এসে বসল। একজন যেন একটু ফ্যাকাসে। অসুস্থ মনে হয়। আর একজন একটা সুটকেস তার ও টিমির মাঝখানে রাখল। টিমির নজরটা গান বাজনা ছেড়ে ওই দুটি তরুণীর দিকে পড়ল। না বলা অনেক কিছু যেন ওই দুজনের মধ্যে রয়েছে মনে হতে লাগল।

পরের স্টপে ওরা নেমে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। টিমির চোখটা ছিল ওদের সুটকেশটার দিকে। ওরা নামবার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। যখন ওরা নেমে গেল টিমির পিছনে একজন বলে উঠল, 'ওই মেয়েরা সুটকেসটা ফেলে গেল।'

'না ওটা আমার।' টিমি তাড়াতাড়ি বললে।

'না আমি দেখেছি, ওরা ওটা নিয়ে উঠেছিল।'

এইতো সুযোগ।

'না ওটা আমার।'

'কিছুতেই নয়।'

না তর্ক করে সুবিধা হবে না।

'আপনি এটা আমাকে নিয়ে উঠতে দেখেন নি ?'

মেজাজ খারাপ করা চলবে না।

'সত্যি কথা বলুন।'

'এর চেয়ে বেশি সত্যি আর কি বলব ?'

অন্য লোকেরা এখন আমার দিকে দেখছে। হায় ভগবান, এখন কি করব ?

'আজ ওর কপালটা ভাল।' আর একজন যেন পিছন থেকে বললে।

হা হা করে একজন মহিলা হেসে উঠল। 'আমি তোমার জিনিস নিই, তুমি আমার জিনিস নাও।' হা হা করে ও হেসে উঠল। হাসির চোটে ও যেন কাঁপতে লাগল।

'ওকে ছেড়ে দাও না বাবা।' পিছন থেকে একজন বুড়ো মানুষের গলার স্বর শোনা গেল। 'কেবল একজনই তো বলছে যে সে মেয়েদুটিকে সুটকেসটা নিয়ে বাসে উঠতে দেখেছে। আর একজনই বলছে যে সুটকেশটা তার। একজনের বিরুদ্ধে একজন। যে বলছে সুটকেসটা তার, তাকে

রাখতে দাও। আর যার বিশ্বাস যে সুটকেশটা ওই মেয়ে দুটির, তাকে তাই বিশ্বাস করতে দাও। হাসির রোল উঠল। বিতর্কটা আবার শুভ নববর্ষের উত্তেজনায় ও গানে ডুবে গেল।

টিমির ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। সেই জিতল তাহলে।

বাসটা থেমে গিয়েছিল। সে নেমে পড়ল। কেউ কিছু বলাবলি করছে না কি? কেন যে লোকেরা একজনকে শান্তিতে থাকতে দেয় না?

বাস থেকে নেমে তার এক সঙ্গে আশা দুশ্চিন্তা ও কৌতূহল জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে, কি আছে ভিতরে।

সুযোগ। একটা মারাত্মক সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে সে। রাস্তায় চলতে চলতে সে ভাবতে লাগল।

টিমি লক্ষ্য করে নি যে সে চলতে চলতে লোকের ভিড়ে গিয়ে পড়েছে। দুজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সেই ভিড়ের ভিতরের লোকগুলির উপর তল্লাশি চালাচ্ছিল। একজন পুলিশের ব্যাজটায় আলো পড়ে চকচক করে উঠতেই তাকে থামতে হল। তাড়াতাড়ি সে একজন চীনার বাড়ির উঠান সামনে দেখে সেখানে ঢোকবার চেষ্টা করল। আজ যেন ভাগ্যটা তার সহায়। বন্ধ লোহার দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে তার বুক যেন ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

এইখানে সে প্রায় মিনিট পনেরো দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে রাস্তায় কি ঘটেছিল, তা তার জানবার কোন উপায় ছিল না। রাস্তায় স্বাভাবিক গোলমালটা যেন চরমে উঠল। হঠাৎ কি করে, সে নিজেই তা বুঝতে পারে-নি, সে নিজে যেন এই গোলমালের মাঝখানেই বসে আছে।

একটা কাঠের বাক্সর উপর সে বসেছিল। একবার সে ভাবলে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে হয়। বোঝাটা এখানেই ফেলে যাবার কথা সে ভাবলে একবার। হাজার হলেও ওটাতো তার নয়।

ওটাতো তার নয়। এই কথাটা মনে হতেই তার মনে হল যে তার নয় বলেই তো সে এত কাণ্ড করেছে এইটার জন্য। বাসে যে ঘটনাটা ঘটল, তার থেকে সুটকেসটা যে তার নয় এই নগ্ন সত্যটি বার হয়ে আসে। তাই তার মনে হল যে সুটকেসটা তার নিজের নয় বলেই, তার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার। এইখানে সে চোরের মতন বসে রয়েছে তার কারণ এটা তার নয় বলেই। এটা এখানে ফেলে গেলে কি রকম হয়? কিন্তু এটার ভিতরে তো খুব মূল্যবান অনেক কিছু থাকতেও পারে। টিমি ভাবলে সুটকেসটা তাই এত ভারি। এ ছাড়া আর অন্য কি বা হতে

পারে ? আর তা না হলে ভগবানই বা তাকে কেন আজ এটা দিলেন। তার স্বর্গত পূর্বপুরুষদের তার উপর দয়া হয়ে থাকবে নিশ্চয়। তাকে ক্ষুধার্ত শিশু ও অসুস্থ স্ত্রী নিয়ে সংসার করতে হয়। তার মনের মধ্যে একটা প্রতিজ্ঞা যেন দৃঢ় হয়ে উঠল। না সে কিছুতেই এই সুটকেসটা হাতছাড়া করবে না।

যেসব লোকেদের আটক করা হয়েছিল তাদের তুলে নিতে পুলিশের গাড়ি এসে গেল। টিমি ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল। পাছে স্নায়বিক শক্তি হারায় তাই সে পিছনে তাকাতে সাহস করছিল না। হাজার হলেও এ ধরনের কাজ তার নয়। হঠাৎ তার দেখা হয়ে গেল, সেই প্রচণ্ড বাক্যবাগীশ পিটসোর সঙ্গে।

'আরে টিমি যে। অত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছো। তুমি আসছো না যাচ্ছ ?'

'আসছি।' টিমি তাকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টায় কথা বাড়াতে চাইলো না।

'তোমার নামের অক্ষরগুলো, এ—জে—বি হল কবে থেকে ?'

'আমিই যে এ জে. বি. এ কথা কে বললে ?'

'কেন, এইখানে।' পিটসো সুটকেসের উপর বড় হরফের লেখাটার দিকে আঙ্গুল দেখাল। তার চোখে বিদ্রূপ।

'ও, ওটা আমার এক আত্মীয়ের।' টিমির মনে হল ওই লোকটার মুখের হাসিটা যদি মুছে দেয়া যেত। এরই জন্য নিজেকে কত অসহায় মনে হচ্ছে। অথচ পিটসো ও তার হাসিটা অবিচ্ছেদ্য। যেমন ঠিক ওর মুখটা। না নার্ভাস হলে চলবে না। আর হলেও তা দেখানো চলবে না। 'আমার স্ত্রী অসুস্থ পিটসো, আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।' ও চলে গেল। পিটসোর হাসিটা যেন রয়েই গেল মিছামিছি।

শেভ্রলে গাড়িখানা ফুটপাতের ঠিক ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর যেন সেটাকে রাখা হল হালকা ভাবে।

'ওহে,' টিমি তার বাঁ দিকে তাকাল। তার গলাটায় কি যেন একটা পুঁটলি পাকিয়ে উঠছে। 'ওহে বাবাজি থাম।' গাড়ির ড্রাইভার তার দিকে আঙ্গুল দেখাল।

দুজন শ্বেতাঙ্গ কনেস্টবল ও সাদা পোষাকে একজন আফ্রিকান। ওরা পিছনের সিটে বসে। সে বুঝতে পারল যে পালাবার চেষ্টা করাটা বোকামি হবে। সে দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার নেমে এসে তার সুটকেসটা ধরল।

আর তার কাঁধ ধরে তাকে গাড়ির দিকে টানল। ওকে গাড়িতে তুলে থানার দিকে নিয়ে চলল।

টিমির হাঁটুটা কাঁপতে লাগল যখন সে পাশের কালো লোকটিকে চিনতে পারল। এই সেই লোকটা, যার সঙ্গে বাসে তার তর্কাতর্কি হচ্ছিল যে সুটকেসটা কার। লোকটা যেন একেবারে ধর্মপুত্তুর। এই নববর্ষের দিনেও এমন একটা ব্যপার করতে হবে। না কি লোকটা ডিটেকটিভ? লোকটা টিমির দিকে তাকাচ্ছিল না। একটা ধার্মিকসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে সে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। অন্তত টিমির তাই মনে হচ্ছিল।

টিমি ভীষণ বিরক্ত হল। সে ঠিক করল যে সে লড়ে যাবে। কে জানে এই হয়তো কোন ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা।

থানায় পৌঁছে সুটকেসটাকে কনেস্টবলরা একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। এমনভাবে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল যে টিমির মনে হল তাদের চোখের ভাষায় যেন কি একটা খেলে গেল।

'নাও বল কি ব্যাপার?' তাদের মধ্যে একজন কতকটা ভদ্রভাবেই তাকে বললে। তার সামনে সে সুটকেসটা রাখল।

'কার সুটকেস?'

'আমার।'

'তোমার নিজের জিনিস এখানে আছে?'

'আমার স্ত্রীর।'

'কি কি আছে?'

'বোধ হয় ওর পোষাক-টোষাক।'

'বোধ হয় বললে কেন?'

'মানে, ও তাড়াতাড়িতে কি রেখেছে তা জানি না। ও বললে ওর মাসীর বাড়ি ওগুলো পৌঁছে দিতে, কি দিয়েছে না দিয়েছে আমি দেখি নি।'

'তোমার স্ত্রীর জিনিসগুলো তুমি চিনতে পারবে তো?'

'কিছু কিছু।' টিমি ভাবল। সমস্যাটা এত সোজা করে দিলে কেন; অথচ কি রকম একটা ঠাণ্ডা বিদ্রূপ শ্বেতাঙ্গ লোকটার চোখে।

কনেস্টবল সুটকেসটা খুলে জিনিসগুলো বার করতে শুরু করলে।

'এটা কি তোমার স্ত্রীর?' একটা ছেঁড়া জামা বার হল।

'হাঁ।'

'এটা? এটা?' টিমি দু বারই হাঁ বললে। এত ছেঁড়া জামা কাপড় ভরেছে কেন? কনেস্টবলটা একটা একটা করে বার করতে লাগল।

টিমি ভাবতে লাগল, ভাগ্য আবার এ কি জুয়া খেলছে তার সঙ্গে ? কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল যেন।

জামাকাপড়গুলো বার করবার পর কনেস্টবল সুটকেসের ভিতর একটা জিনিসের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'এটা অবশ্যই তোমার স্ত্রীর।'

টিমি গলা বাড়িয়ে তাকল। একটি মৃত শিশু। ঘণ্টা বারো আগে হয়ত জন্মেছে। নগ্ন মৃত্যুর যেন সাক্ষাত প্রতিকৃতি। টিমির মাথা ঘুরতে লাগল। তাকে ধরতে হল। এখন সে পুরো সত্যি কথাটা স্বীকার করল। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া খেলাই বটে। আর এর মূল্য ? আঠারো মাসের সশ্রম কারাবাস।

[The Suitcase]

অনুবাদ : জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

সর্প গহ্বর

আল্ফ্ ওয়ানেনবার্গ

'বারে'র চারপাশে ডক-শ্রমিকদের বেশ ভিড় জমেছে ; সেই সঙ্গে ভিড় করেছে ক্রেন-ড্রাইভাররা। এরা সব দিনের বেলার শ্রমিক। সেই ভিড় ঠেলে অ্যান্ডি আর আমি কাউণ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাউণ্টারের ওপাশে মদ পরিবেশন করার জন্যে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল তাকে ইশারা ক'রে বললাম—'আমাদের মদ দাও'। ঠিক এই সময় লক্ষ্য করলাম একটি বেঁটে চেহারার লোক তার সঙ্গীকে বলছে : আমার বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর থেকে এক ফোঁটা মদও আমার পেটে পড়ে নি। যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।'

লোকটির প্ল্যাসটিক শার্টের কলার থেকে একটা কালো 'টাই' ঝুলছিল।

কাউণ্টারের আর এক দিকে দেখলাম মাইক আর জিম বার্টনকে। ছেঁড়া স্পোর্টস কোট আর ডোরা-কাটা শার্ট গায়ে-দেওয়া একটি লোক তাদের কি সব বলছিল। সেই কথা তারা শুনছিল। দেখে মনে হলো সেকথা শোনার জন্যে তাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাইক ঘাড় নেড়ে আমাকে জানালো যে সে আসছে। মদ পরিবেশকটি সরে গিয়ে ছ'পেনি দামের দুটো মোটা ভাঁড়ে ব্র্যানডি ঢেলে অ্যানডি আর আমাকে দিয়ে গেল। অ্যানডি এতক্ষণ অস্বচ্ছ মাপের যন্ত্র আর ময়লা মদের পিপেটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

সেই বেঁটে চেহারার লোকটি বলছিল—'…কিন্তু আমি এখন মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি—নিশ্চয় বলছি—মাইরি !'

অ্যান্ডি জিজ্ঞাসা করল—'এ জায়গার নামটা কি বলছিলে যেন।'

'সর্প গহ্বর'।

'মানে—এরকম একটা নাম··· ?'

সেই বেঁটে লোকটা বলে যাচ্ছিল—'···আমি নিশ্চয় তখন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম ; অথবা ওই জাতীয় কিছু। প্রত্যেক রাত্রিতেই আমি মদে চুর হয়ে বাড়ি ফিরে দেখতাম আমার স্ত্রী অসুস্থ বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে রয়েছে।···বাচ্চাটা কী ফুটফুটে ছিল কি বলবো···আমাদের প্রথম বাচ্চা··· আর আমি···বেশির ভাগ সময়ই মদে চুর হয়ে থাকতাম···'।

'দেখ, দেখ! বড় লোকদের সরাইখানা থেকে কে এসেছে দেখ—এখানে এসেছ যে ?—'

আমার কাঁধে একটা হাত রেখে কথাগুলি বললো মাইক।

'অ্যানিডিকে কেপ টাউন শহরটা একটু দেখাচ্ছি আর কি! ও এসেছে যো' বার্জ থেকে—এখানকার বস্তিগুলো দেখতে ওর আগ্রহ হয়েছে।'

আমাদের মধ্যে আলাপ পরিচয় হয়ে গেলো। ছেঁড়া কোট আর ডোরা-কাটা শার্ট গায়ে দেওয়া লোকটিকে বাদ দেওয়া হলো। তবুও সে আমাদের সঙ্গে জোর ক'রে করমর্দন করলো।

সেই বাঁটকুল লোকটি তখনও বলছিল :···'আর ওই হতভাগা সরকার কী করছে! সারা দেশটাকে একেবারে নোংরা ক'রে ফেলেছে। আর আমি নিজে করেছি কী ? আমার স্ত্রী আর বাচ্চাটার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছি।'

মাইক বললো : 'সেদিন রাত্রিতে গ্র্যানডে রাজনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। খুব উঁচু ধরনের আলোচনা। একটা লোকই কেবল বকবক ক'রে আমাদের বিরক্ত করছিল। জিজ্ঞাসা করছিল কাফেরদের সঙ্গে আমাদের বোনেদের আমরা বিয়ে দিতে চাই কি না।'

অ্যানডি বললো : 'দক্ষিণ আফ্রিকার সেই আদ্যিকালের গণতন্ত্র।—নিজের শ্যালক নির্বাচন করার ক্ষমতা প্রতিটি আঠারো বছর বয়সের সাদা চামড়ার ছোকরার রয়েছে ; একেই বলে তার জন্মগত অধিকার।'

আমার মনে পড়ে গেল অ্যানডি চিরকালই আগুনে রাজনীতিবিদ—রাজনীতির কথা উঠলেই তার মাথা একেবারে গরম হয়ে ওঠে।

মদের কাউণ্টারের ওপরে একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে, আর মাথা দিয়ে সেখানে গুঁতো লাগানোর ভঙ্গি ক'রে জিম বার্টন বলল—আমি তাকে গুলি করবো!'

অ্যানডি জিজ্ঞাসা করলো—'কাকে ?'

'বোনকে—যদি সে দেহাতী লোককে বিয়ে করে'।

কপালে একটা চপেটাঘাত ক'রে আর খুব হতাশ হয়েছে এই রকম একটা

ভাব ক'রে মাইক বলল: 'হায় ক্রাইস্ট! আমাকে বাঁচাও—আমাদের সবাইকে বাঁচাও!'

যারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করার মত ধর্মযোদ্ধা বা মিশনারি অ্যানডি নয়। একথা ভেবে কিছুক্ষণ আমি বেশ খুশী হয়েছিলাম। রাজনৈতিক কচকচি আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তারপরেই সেই ছেঁড়া কোট আর ডোরা-কাটা শার্ট গায়ে লোকটা সামনে এগিয়ে এসে তার বক্তব্য পেশ করলো:

'কিন্তু যাকে পছন্দ হয় তাকেই তোমার বোন বিয়ে করবে না কেন? তাদের মধ্যে কিছু ছোকরা রয়েছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা ক'রে ডিগ্রী পেয়েছে, এবং···'

একটি সম্ভাব্য ধর্মান্তরিত মানুষ! সুযোগ পেলেই যে মানুষকে ধর্মান্তরিত করতে অ্যানডি ওস্তাদ সেকথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি শুরু করলাম: 'একটি বিখ্যাত হোটেল রয়েছে। সেখানে আগে সোনা আর হীরের কারবার···তোমাদের বোধ হয় মনে রয়েছে সিসিল জন রোডস, আই· বি. ডি···এবং গত মাসে যে সেখানে গুলিবাজি হয়েছিল···'

কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি। সেই সন্ধ্যায় অ্যানডিকে আমরা হারালাম। সেই ছেঁড়া কোট আর ডোরা-কাটা শার্ট পরা লোকটির দিকে সে এগিয়ে গেল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। লোকটা তার শূন্য গ্লাসটা অ্যানডির সামনে এগিয়ে দিল। কাউন্টারের লোকটা সেই গ্লাসে চিটচিটে মদ ঢেলে দিল। অ্যানডি বিরক্ত না হয়েই মিটিয়ে দিল দাম।

মাইক বললো: 'আমি এখন গ্র্যানডের দিকে চললাম। আশা করি, আমাদের সেই বিবাহ বিশারদ লোকটি—আমাদের বোনেদের সম্বন্ধে যে এতটা আগ্রহী—সে সেখানে নেই।'

শহরবাসীদের সামরিক প্রশিক্ষণ শিবিরে জিম বার্টন কিছুদিন শিক্ষানবিসি করেছিল। সেই সময় আগ্নেয় অস্ত্রের সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য সে শিখেছিল, যথা—বন্দুকের নলের ব্যাস, গুলির গতিবেগ, দূরত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পিছু পিছু সেও ওই শব্দগুলি বিড়বিড় ক'রে বলতে-বলতে এগোতে লাগলো।

সেই বেঁটে লোকটি তখন বলছিল: 'আমার উপদেশ শুনে সেইমত কাজ করুন। দক্ষিণ-পশ্চিমে আমি হিসাব-পরীক্ষার কাজ পেয়েছি। এতদিন যা করছিলাম সে-সব আমি ছেড়ে দিলাম। নতুন জীবন শুরু করছি এবারে। আমার স্ত্রী আর অন্যান্য বাচ্চাদের জন্যেই এ কাজটা আমাকে নিতে হচ্ছে···'

তার সঙ্গীটি আপত্তি জানিয়ে বললে : 'এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে লাভ কি ? সেখানেও সেই একই জিনিস তুমি দেখতে পাবে। আমার মনে হয়, এখানে থেকে লড়াই কর তুমি। সেই ভাল। এখানেই শুরু কর নতুন জীবন। তাহলেই সত্যি তুমি যে কিছু করেছ তা বলতে পারবে।'

বেঁটে লোকটি বললো : 'আর প্রলোভন, এদের নিয়ে আমি কি করবো ? প্রথম প্রথম তোমার মনে হবে ঠিক ভাবেই কাজ ক'রে যাচ্ছ তুমি। তার পরেই পুরানো একটি বন্ধুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেল। ব্যস ! আবার সেই পুনর্মূষিক। সব প্রতিজ্ঞা ছত্রাকার—জাহান্নামে চলে যাবে।'

'...তাহলে, তোমার কাছে কিছু প্রচার পুস্তিকা পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে তাদের আমি বলবো। মানে, পড়ার মত আর কি ! সেগুলি পড়লে তোমার উপকার হবে।'

নতুন বন্ধুটির নাম আর ঠিকানা একটা ছোট কালো রঙের নোট-বইতে টুকতে-টুকতে অ্যানডি কথাগুলি বললো।

তার সঙ্গীটি বললো : 'তোমার যদি ইচ্ছে থাকে এবং যে-পথে বর্তমানে তুমি চলছো, সেই পথটা বর্জন করার শক্তি যদি তোমার থাকে তাহলে, সেই বইটির শিক্ষা গ্রহণ না ক'রে তুমি পারবে না।

নতুন বন্ধুটিকে ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করলো অ্যানডি : 'তাহলে কোন্ সমাজে আমরা বাস করছি ?'

'বহু-জাতীয়।'

'কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র অবশ্যই হচ্ছে...?'

'জাতি নিরপেক্ষ।'

'অর্থাৎ...?'

'সবার অধিকার সমান। এবং তারই ভিত্তিতে আমার বোন তার পছন্দ-মত যে কোন ছোকরাকে বিয়ে করতে পারে।'

নিজের আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে অ্যানডি বললো : 'তোমার মত চিন্তা করে এমন কোন বন্ধু কি তোমার রয়েছে ? এস, আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে একটু আধটু...'

নতুন বন্ধুটি আর এক গ্লাস মদের প্রত্যাশায় শূন্য গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল : 'হ্যাঁ, সম্ভবত সেরকম বন্ধু আমার রয়েছে। তবু কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবো। কোন দেহাতীকে কি তুমি এখানে আমাদের মধ্যে বসতে অনুমতি দেবে ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয় ! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করছো ! মানে,...'

'কিন্তু আমি রাজি নই। আমার বোন তার পছন্দমত কোন দেহাতী

ছোকরাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু সেই ছোকরাকে সে আমার বাড়িতে আনতে পারবে না। দেহাতীরা এখানে এসে আমাদের মধ্যে বসুক তাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে—সেভাবে আমি মানুষ হই নি!'

এই বলে, আর এক গ্লাস মদের জন্যে সে অ্যানডিকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কিন্তু অ্যানডি আমার একটা হাত জাপটে ধ'রে রাস্তায় বার ক'রে নিয়ে এল। আমাকে বার ক'রে এনে সে একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো। বাড়িটার গায়ে লাল আর সাদা রঙে মেশানো একটা চিহ্ন ছিল। সেই রঙটাকে তার পুরানো টিক কাঠের দরজার সঙ্গে বড় বেমানান দেখাচ্ছিল।

এস. এ. রেল

খাবার রাখার টেবিল

কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্যে

প্ল্যাসটিক শার্টের সঙ্গে কালো টাই-পরা বেঁটে লোকটি আমাদের পিছু পিছু রাস্তার ওপরে বেরিয়ে এসেছিল। সে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। আমরা কী দেখছি তাই দেখতে লাগলো সে।

অ্যানডি জিজ্ঞাসা করলো: 'এই জায়গাটার নাম তারা কি দিয়েছে বলছিলে?'

'সর্প গহ্বর'।

ওই রকম নাম কেন দেওয়া হয়েছিল সেকথা সে জিজ্ঞাসা করলে না। সে শুধু হাসলো। তার হাসি দেখে মনে হলো অর্থটা সে বুঝতে পেরেছে।

সেই বেঁটে লোকটি বিড়বিড় ক'রে বললো: 'এই নামের একটা সিনেমা দেখেছিলাম। সেটা হচ্ছে একটা পাগলা গারদের কাহিনী।'

[The Snake Pit] অনুবাদ: সুনীলকুমার ঘোষ

বস্তি

ইজিকিয়েল মাহাফেল

'সেকেণ্ড অ্যাভিন্যু'-র জীবনযাত্রায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিলাম— আমার ভাই, বোন আর আমি। এই ধরনের অ্যাভিন্যু এবং স্ট্রীটগুলির সঙ্গে আগে আমাদের কোন পরিচয় ছিল না। মানুষেরা শহরে এসে রাস্তার ধারে সরল রেখা ধরে এইভাবে বাড়ি তৈরি করে কেন?—অবাক হয়ে আমি ভাবতাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে ছোট ছোট বাড়ির খুপরিতে মানুষরা যায়-ই বা কেন? নিজের নিজের এলাকার চারপাশে বেড়া দিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেই বা রাখে কেন? মাউপানেঙের মানুষরা তো এভাবে থাকতো না। সেখানের বাড়িগুলো কোন রকম নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার ধারতো না। সেখানে সব বাড়িতেই আমরা সহজে ঢুকতে পারতাম। সবাই মিলে আগুন পোয়াতাম, আর সারা রাত্রি ধরেই গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু এই সেকেণ্ড অ্যাভিন্যুতে সেরকম কোন সুযোগ আমাদের নেই। কিন্তু এখানে একটা জিনিস ছিল। বাইরে থেকে দেখে মনে হতো কারও বিষয়ে এদের কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু তবু তারা এমন ভাবে কথাবার্তা বলে যে মনে হয় তাদের মধ্যে একটা একতা রয়েছে। তারা যে একই গোষ্ঠীর সেটা এখনও তাদের আচার-আচারণ থেকে বোঝা যায়।

আমার ঠাকুমা ছিলেন বিরাট একটি পরিবারের মাথা। তিনি ছিলেন মোপেদি। তাঁর বাবাও ছিলেন একজন মফাহ্‌লেলি সম্প্রদায়ের। কিন্তু আমার বাবার সঙ্গে তাঁর কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না। অনেক লোককেই মফাহ্‌লেলি পদবি দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যে মফাহ্‌লেলি সম্প্রদায়ের প্রধান এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর নিজস্ব বংশের মানুষ ছাড়া অন্য সবাইকে অন্যান্য পদবি গ্রহণ করতে হবে। তার ফলে বোঝা যাবে যে নিছক নামের জন্যেই তাঁর সঙ্গে তাদের কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু

তার পরে, অনেক লোকই শহরে চলে গেল। তারই ফলে, এই নির্দেশটি তিনি বাতিল করে দিলেন। আমার ঠাকুমার বিয়ে হয়েছিল লিডেনবার্জ জেলার সেখুখুনিল্যানড-এর টিটাস মোগ্যালের সঙ্গে। তিনি ছিলেন একজন মোপেদি। ক্যাপটেন রিটারের নেতৃত্বে পররাজ্য আক্রমণকারী শ্বেতাঙ্গ অ্যামেরিকানরা রাজা সেখুখিনিকে যখন তাঁর পার্বত্য এলাকা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছিল সেই সময় ওঁরা দুজনেই শিশু ছিলেন। আগ্রাসী অভিযানকারীরা বাপেদীর রাজাকে বন্দী করতে অসমর্থ হলে, রিটার রক্ত-লোলুপ সয়াজিসদের সংঘবদ্ধ করে রাজার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তারা নানা রকম ছলচাতুরীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে সেই রাজ্যে প্রবেশ করে; তারপরে সেই পার্বত্য এলাকার প্রতিটি পুরুষ, নারী আর শিশুকে হত্যা করে, বন্দী করে রাজাকে। সেই জন্যে আজ পর্যন্ত বাপেদী যে তাদের কত ঘৃণা করে এসেছে সেকথা ঠাকুমা আমাকে বলেছিলেন।

পূর্ব ট্রানসভালের একটি অঞ্চলে আমার মা, আণ্ট ডোরা আর আমার তিনজন কাকা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আণ্ট ডোরা, তাঁর তিনটি বাচ্চা আর তিনজন কাকা আমাদের সঙ্গে থাকতেন। আমাদের ঘর ছিল দুটি; দুটিই শোওয়ার ঘর, এবং যে ঘরটিতে একটি টেবিল আর চারটি চেয়ার পাতা থাকতো সেটি ছিল আমাদের বসার আর শোওয়ার ঘর। পেছনের বারান্দায় আমরা রান্না করতাম। ঠাকুমা তিনটি ঘর দীর্ঘমেয়াদে ভাড়া দিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন পরিবারের জ্যেষ্ঠা। শহরের বাইরে একটি বাড়িতে আমার মা চাকরানীর কাজ করতেন; এবং সেখানেই তিনি থাকতেন। পনেরো দিন অন্তর রবিবার তিনি আমাদের দেখতে আসতেন।

যেসব যুবকেরা শহরগুলিতে কাজ করার জন্যে বাসা বেঁধেছিল গ্রামাঞ্চলে, চাঁদনি রাতে তারা যেমন নিজেদের মধ্যে কুস্তি করত এখনও তারা তাই করে; এবং সেই জন্যে প্রতি রবিবার অপরাহ্নে প্রশস্ত মানবিক মাংসপিণ্ডগুলি, যাদের তারা বলত পা, নিয়ে শহরের বাইরে মার্চ করতে করতে এগিয়ে যেত। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলে ভাগ হয়ে এগিয়ে যেত তারা। প্রিটোরিয়ার বাইরে এই 'সেনাবাহিনীর মানুষদের' এক টুকুরো জমি দেওয়া হত; তাদের তদারকি করল পুলিশের দল, প্রিটোরিয়ার সিটি কাউনসিল বলত এইভাবে 'নেটিভরা তাদের বীরত্ব প্রকাশ করত'।

আমাদের বাড়ির মুখটা ছিল বারবার স্ট্রীটের দিকে। রবিবারের বিকালগুলিতে বারান্দার উপরে বসে থাকাটা আমাদের পরিবারের মানুষদের কাছে আমোদ-প্রমোদের সামিল ছিল। 'সেনাবাহিনীর' মানুষেরা আলকাতরার উপর দিয়ে তাদের বিরাট বিরাট পা ফেলে আমাদের বাড়ি

ছড়িয়ে চলে যেত, যে যার নিজেদের কাজে চলে যাওয়ার আগে পুলিশ-বাহিনী আমাদের বাড়ির সামনে এসে ছড়িয়ে পড়ত, নিজেদের আস্তানায় ঢোকার পথে শহরাঞ্চল থেকে আগত চাকর-চাকরানীরা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেত ; আবার নিজেদের কাজে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়েই এগিয়ে যেত তারা। রবিবারের বৈকালে আমরা প্রায় দেখতাম থানায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোনো পুলিশ কোনো লোকের গলার জামা ধরে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে। নানান রঙের আর ঢঙের পোশাক-পরা মহিলারাই আমাদের মুগ্ধ করত বিশেষভাবে। কেউ কেউ উঁচু শুকতলা দেওয়া জুতো পরে কুৎসিৎভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত ; মনে হয়, তাদের পায়ের তলায় জুতোর কাঁটা ফুটছে। অন্য সবাই সত্যিসত্যিই বেশ চটপট করে হাঁটত, তাদের চলার ভঙ্গি দেখে আমাদের বেশ হিংসেই হত।

আমাদের বাড়ির বেড়াকে অনবরত টেনে বাঁধতে হত ; কারণ, সেটা রোজই ভেঙে পড়ত। ঠাকুমা বলতেন ফুলগাছ লাগানোর সখ তাঁর খুব। আমরা বীর-বিক্রমে ফুলগাছ লাগানোর চেষ্টা করেছিলাম ; কিন্তু ফুলগাছের জন্যে পুকুর থেকে জল নিয়ে আসার মতো সাহস আমাদের কারও ছিল না। আমরা কেবল একটা দ্রাক্ষালতা পুঁততে পেরেছিলাম। গাছটা বেশ চমৎকার ছায়া দিত ; আর তারই ছায়ায় পরিবারের লোকেরা কাচাকুচি করত। আমাদের লোহার গেটে মরচে ধরে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেইটা নিয়েই আমাদের যত ঝামেলা। তার নিচে যেসব কাঠের খুঁটো ছিল সেগুলিকে পিঁপড়েরা কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল। আমরাও বারবার খুঁটো পুঁততে লাগলাম। তারপর গেট, আমরা, আর গেটের চারপাশে যা কিছু ছিল সবকিছু বেঁকে ত্রিভঙ্গ মুরারির মতো হয়ে গেলাম। তারপরে, গেটটাকে আগের অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে খুঁটোগুলির চারপাশে আমরা পাথরকুচি স্তূপাকার করে সাজিয়ে দিলাম। টিনের দেওয়ালের চারপাশে দশফুট জায়গাটাকে আমরা অবশ্য ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করলাম। গেট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত মহিলারা একটি সুন্দর রাস্তা তৈরি করেছিলেন, দ্রাক্ষালতার ডালগুলিকে বাড়ির পেছনে তাঁরা বাঁকিয়ে দিয়েছিলেন। এই রাস্তাটার দুপাশে ছোটো ছোটো মাটির ঢিপি দিয়ে উঁচু করে দেওয়া হয়েছিল। মেঝেটার উপরে লেপটে দেওয়া হয়েছিল মাটি ; মসৃণ একটি পাথর বসানো হয়েছিল তার উপরে ; তার উপরে মাখিয়ে দেওয়া হয়েছে গোবর। ছোটো ছোটো ত্রিভুজের মতো করে সাজানো হয়েছিল পাথরের নুড়ি। আমাদের একটা ছাইয়ের গাদা ছিল। উনোন ধরানোর জন্যে কয়লা বার করার উদ্দেশ্যে সেই

গাদাটাকে আমরা রাতদিন খোঁড়াখুঁড়ি করতাম। সেই গাদা থেকে সরিয়ে রাখার জন্যে দুটোর মাঝখানে একটা ছোটো দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে জঞ্জাল ফেলার পাত্রে আমরা ছাই ঢেলে দিতাম। আমাদের উঠোনের সামনের যে অংশটা বারবার স্ট্রীট আর সেকেণ্ড অ্যাভিন্যুর সংযোগস্থলে গিয়ে শেষ হয়েছিল সেইখানে আমরা প্রায়ই ভুট্টার চাষ করতাম। জমির এই অংশ থেকে অধিকাংশ বছরে আমরা ঠিক সাত চাঙড় ভুট্টা তুলতাম। আমাদের মতো বাচ্চারা তুলত আধ চাঙড় করে। আমাদের বাড়ির পেছনের উঠোনটাকে আমরা চারফুট উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম। সেই উঠোনের মেজেটা ছিল মাটির ; কারণ, সেখানেই আমরা রান্না করতাম ; দুটো আলাদা ঘর ছিল সেখানে। একটাতে আমরা রান্না করতাম, আর একটিতে রান্না করত আমাদের ভাড়াটেরা। এই ঘর দুটির, আর পেছন থেকে যে পথটা সোজা সামনের দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেটি—এদের সামনে ছিল ছোটো একটি বারান্দার দিকে। শীতকালে এইটিকেই আমরা রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমাদের রান্না করার টেবিল ছিল একটা কোণে। কারণ যতদূর মনে হচ্ছে, পিটারসবার্জ থেকে আসার পর থেকেই টেবিলটাকে আমরা ওইখানেই দেখেছি। এই বারান্দার মেঝেটার দৈর্ঘ দশফুটের বেশি হবে না। তার উপরে বিছানো ছিল এবড়ো-খেবড়ো কতকগুলি ভাঙা-ভাঙা স্লেট পাথবের চাঁই। আমরা সেই পাথরের চাঁইগুলিকে যত জোরেই ঘষি না কেন তাদের উপরে সব সময় মোমবাতির মোম জমাট বেঁধে থাকত ; মনে হত তাদের পিঠে অনেক বিষফোঁড়া গজিয়েছে।

আর এক কোণে থাকত ম্যাথিবুলার কম্বলগুলি আর চট। একটা সাবানের উপরে সেইগুলি পেতে সে শুত। সে ঘুমাত আমাদের বারান্দায়। সে ছিল ডাইনী-ডাক্তার। আশ্রয়ের খোঁজে সে একদিন এখানে এসে হাজির হয়েছিল। জানা গেল, পূর্বাঞ্চলের সাঙ্গানাল্যাণ্ড থেকে সে এসেছে। মাথা গোঁজার মতো কোনো জায়গা তার নেই। ঠাকুমা তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাদের উনোনের চারপাশে যে ছাই জমতো তা নিয়ে আমাদের সমস্যার আর অন্ত ছিল না। টিনের দেওয়ালগুলি সব সময় ঝুলে বোঝাই হয়ে থাকত। ফাঁকা ছিল বারান্দার কেবল ধারটুকু। সেই ফাঁকা জায়গার উপরে চিপ্‌লী তার হিসাবপত্র লিখে রাখত। লোকটা ছিল ভারতীয়। সে মদ ছাড়া অন্য সব রকম পানীয় দ্রব্য ফিরি করে বেড়াত। সেই পেছনের উঠোনের এক প্রান্তে প্রতিদিন সকালে দেখা যেত ম্যাথিবুলা একটা মাদুরের উপরে বসে রয়েছে। তার সামনে বিছানো রয়েছে হাড় ; আর সে সাঙ্গানার ভাষায় বিড়বিড় করে মন্ত্র আউড়ে যাচ্ছে। আমরা

সকলে, আর অতিথিরাও, যতটা সম্ভব তার সেই যাদুবিদ্যার প্রভাব থেকে দূরে থাকার জন্যে চেষ্টা করতাম।

আমার বোন আর ভাই খুব ছোটো ছিল বলে সংসারের বেশি কাজই আমি করতাম। আমার কাকারা এত বড় ছিলেন যে তাঁদের দিয়ে সেসব কাজ করানোর কথা কেউ ভাবতে পারত না। আমি উঠতাম ভোর সাড়ে চারটের সময়; পায়খানায় যাওয়ার জন্যে একটা পুরানো বালতিকে উনোন করে তাতে আগুন দিতাম। বাসনপত্র পরিষ্কার করতাম, সকলের জন্যে তৈরি করতাম প্রভাত-কফি; আর ঠাকুমার জন্যে তৈরি করতাম চা; কারণ, তিনি কফি খেতেন না। 'কফি খাওয়া আমি এইভাবে বন্ধ করেছিলাম'— সেই গল্পটি ঠাকুমা আমাদের কাছে করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। একজন তাঁকে একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। ফলে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত পড়েছিল। সেই পাথরটা তিনি কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। একজন ডাইনী ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু তাতে তাঁর কোনো উপকার হয় নি; কারণ, তারপর থেকে তিনি গরুর মাংস বা কফি খেতে পারতেন না। সেই ওষুধপত্র খেয়ে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

আগের দিন রাত্রির বাসি যবের মণ্ড দিয়ে সকালে আমরা কফি খেতাম। তারপরে স্কুলে যেতাম আমরা। সারাদিন ধরে আণ্ট ডোরা আর ঠাকুমা সাহেবদের পোশাক কাচতেন বলে, স্কুল থেকে ফিরে এসে আমাকে ঘরদোর পরিষ্কার করতে হত; উনোন ধরাতে হত; এশিয়াটিক রিসার্ভ-এ একটা ভারতীয় মাংসের দোকান থেকে নিয়ে আসতে হত মাংস। আমাদের সংসারে এত লোক ছিল যে একটা বড় হাঁড়িতে আমাকে দুবার যবের মণ্ড তৈরি করতে হত। এক পাউণ্ড ওজনের বেশি ভেড়ার মাংস কেনার সামর্থ আমাদের কোনো দিনই ছিল না। সারা সপ্তাহ ধরে আমরা যা খেতাম তার মধ্যে বিলাসিতা কিছুই ছিল না—শুধু যবের মণ্ড আর মাংস। টাকাপয়সা না থাকলে আমরা কেবল টমাটো ভেজে নিতাম। রবিবার ছাড়া অন্য কোনো দিনই আমরা শাকশব্জী খেতাম না। যোহানসবার্গ থেকে কোন অতিথি না এলে কোনো দিনই আমরা মাখন ব্যবহার করতাম না, অথবা দুধ, চিনি আর ডিম মিশিয়ে যে কাস্টার্ড তৈরি হয় সেরকম সুস্বাদু খাবারও খেতাম না আমরা। সত্যি কথা বলতে কি বাড়িতে একসঙ্গে এক পাউণ্ড পরিমাণ মাখন দেখেছি এ-ও আমি স্মরণ করতে পারি নি কোনোদিন। কিনলে বড় জোর ওই তিন পেন্স দামের সস্তা-'টিকে'। সেই সব দিনগুলিতে আমাদের মতো বাচ্চারা লাইন দিয়ে দাঁড়াতাম; আর ঠাকুমা একটুকরো রুটির একপাশে সামান্য একটু মাখনের প্রলেপ বুলিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিতেন।

প্রভাতী ভোজনের সময় রুটি কাটা হত। যাঁরা বয়সে বড় তাঁদের প্রথমে রেকাবীতে করে রুটি দেওয়া হত। তার পরে বাকি যা থাকত সেইগুলিকে আমি পরিমিতভাবে টুকরো আর অর্দ্ধ-টুকরো করতাম। আমার সবচেয়ে ছোটো কাকা, তার বয়স আমার চেয়ে খুব একটা বেশি নয়, তার ভাগটা আগেই নিয়ে নিত। পরিমাণে সেটি ছিল সবচেয়ে বেশি। তার-পরে আমি, আমার ভাই; আর সব শেষে আমার বোন, একই রেকাবীতে আমরা তিনজন খেতাম। নানান আকারের মাংসের টুকরো আমাদের রেকাবীতে ঢেলে দেওয়া হত, এবং বেশ কয়েকবার। আমরা কোনোদিন টেবিলে বসে খেতাম না। কেবল অতিথি এলেই এই আধুনিক পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হত।

রবিবার সকালে প্রায় চারটে নাগাদ আণ্ট ডোরার জন্যে কাচার পোশাক আনতে আমি বেরিয়ে যেতাম শহরাঞ্চলের দিকে। বৃহস্পতি আর শুক্রবার বিকালের দিকে সেই সব কাচা পোশাক আবার আমাকে বাড়ি-বাড়ি দিয়ে আসতে হত। কপাল ভালো থাকলে আমাদের একজন ভাড়াটের কাছ থেকে তার সাইকেল ধার নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হত আমার। সেই ভাড়াটেকে আমরা ডাকতাম 'উম্‌পি' কাকা বলে। তবে যেদিন চাইনিস 'ফা-ফি' খেলার জন্যে জুয়াড়ীদের নাম যোগাড় করার উদ্দেশ্যে অঞ্চলটির মধ্যে সে সাইকেল নিয়ে রোদে না বেরোতেন সেই দিনই সাইকেলটা পাওয়া যেত। সকাল বা বিকালে সাইকেল না পেলে পোশাকের বস্তা মাথার উপরে চাপিয়ে হাঁটা শুরু করতাম—আসতে-যেতে প্রায় চোদ্দ মাইল পথ।

অন্য সব ভাড়াটেদের মতোই উম্‌পিও ঠাকুমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে ঝগড়া করত। ঠাকুমার অপরাধ ছিল ঘরদোর নোংরা থাকলে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। যেদিন ঝগড়া হত সেদিন আমি নিশ্চিন্ত থাকতাম যে সাইকেল আজ আর পাওয়া যাবে না। রবিবার দিন পরার জন্যে আমাকে একজোড়া টেনিশ জুতো কিনে দেওয়া হয়েছিল। হাঁটার সময় সেগুলি আমি ব্যবহার করতে পারতাম না। শীতের সকালে শুধু পায়ে হাঁটাটাই আমার কাছে খুব কষ্টকর ছিল; কারণ, আমার গোড়ালিতে যে-সব বড়-বড় ফাট ধরেছিল তাদের ভেতরে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে খুবই কষ্ট দিত আমাকে।

ফিরে এসে আমি স্কুলে যেতাম। রাত্রিতে বাসনপত্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আর সবাই শুয়ে পড়ার পরেই কেবল আমি স্কুলের পড়ায় মন দিতে পারতাম। তাই রাত্রি দশটার আগে কোনোদিনই আমি বই নিয়ে বসতে পারতাম না। আমরা সবাই একটা ঘরে ঘুমাতাম। সেই ঘরে থাকত

জামাকাপড়ের কয়েটি বাক্স আর রান্নাঘরের জিনিসপত্র। যে ঘরে একটা টেবিল আর কয়েকটি চেয়ার থাকত সেই ঘরে কাকা কাকিমা শুতেন।

সংসারে মানুষ আমাদের অনেক ছিল; কিন্তু বিছানা ছিল মাত্র একটি, তার চারভাগের তিনভাগ লেগে যেত ঠাকুমা আর আন্ট ডোরার ছেলে-মেয়েদের জন্যে। ঘরের মেঝেটা ছিল কাঠের। তার মধ্যে ছিল দুটো বিরাট ফুটো। তারই উপরে আমরা শুতাম। মেঝের নিচে থেকে সব সময় একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ঢুকে আসত। এর সঙ্গে জোট বেঁধেছিল নেংটি ইঁদুরের দল। তারা আমাদের মাথাগুলিকে খেলার মাঠ তৈরি করে নিয়েছিল। খাবার-দাবার আর জামা-কাপড় গুলিকেও তারা তছনছ করে দিত।

মাঝে-মাঝে সেদ্ধ মাংসের টুকরো চুরি করে নিয়ে আমি পকেটে রেখে দিতাম। আমাদের রাত্রির অতিথিরা আমার পকেট কেটে তাদের উৎসব উদ্‌যাপন করার আগে আমি বুঝতেই পারতাম না যে সেটা আমার পকেটে রয়েছে। শীতের প্রত্যুষে লোহার ছাদ থেকে একটা বড় ঠাণ্ডা বরফ-জলের ফোঁটা তোমার গাল বা কানের উপরে পড়লেই চমকে তুমি জেগে উঠবে। একমাত্র জানালাও ঝাপসা হয়ে থাকত; কারণ, সারা রাত্রিই সেটিকে বন্ধ করে রাখা হত। পিটাসবার্জ থেকে বাষ্পচালিত রেলগাড়ি নিয়মিতভাবে যাতয়াত করত; তাদের তীক্ষ্ণ হুইশিলের শব্দও তোমরা শুনতে পেতে। কয়লার মতো কালো পুলিশ-করপোর্যাল নায়েসা ফাস্ট অ্যাভিন্যুর থানার প্রাঙ্গনে পুলিশ বাহিনীকে কুচকাওয়াজ করানোর চিৎকার করত। তাও তোমাদের কানে ঢুকত। তার হুইশিলের শব্দও শুনতে পেতে তোমরা। অনতিবিলম্বেই তোমরা শুনতে পেতে বারবার স্ট্রীট পেরিয়ে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে ভারি বুট পরে মচমচ করে তারা হেঁটে যাচ্ছে। তারপরে তারা থামবে। ভেসে উঠবে আর একটা চিৎকার। তারপরেই এই অঞ্চলের মুখোমুখী যে-সব নিগ্রো আর চীনে দোকানের সারি রয়েছে সেই দিকে ছড়িয়ে পড়বে তারা। দৈনন্দিন রোদে তারা সচরাচর আমাদের অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করত না। তোমাদের ঘুম ভাঙার আগে যদি এসব ঘটনা ঘটে তাহলে বুঝতে হবে কম্বল থেকে উঠতে তোমাদের দেরি হয়েছে। তার ফলে, সকালের বাকি অংশটুকু দৌড়াদৌড়ি, ঝাঁপাঝাঁপি, ঠাকুমার গজগজানি, আর সশব্দ বিলাপধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত। তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে মশা-মাছিতে গিজগিজ করলেও গ্রীষ্মকালে রাত্রিগুলিতে মারাবাস্তাদের দিকে একটা জানালা খুলে রাখাটা বিজ্ঞ কাজ হবে না। ছিঁচকে সিঁদেল চোরের ভয়ে আমরা সব সময় বিব্রত হয়ে থাকতাম। ঠাকুমা

এদের 'দুষ্ট প্রকৃতির নিশাচর' বলে চিহ্নিত করতেন ; তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের জন্যে এই সব বজ্জাতদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই', এবং হচ্ছে সব ডাইনী ; তাছাড়া বৃষ্টির ঝাপটা তো ছিলই। গ্রীষ্ম এবং শরৎকালে প্রিটোরিয়াতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হত।

গ্রীষ্মকালে মারাবাস্তাদে যে বৃষ্টি হত তার কথা কোনোদিন আমি স্মরণ করতে পারি নে। সেই বৃষ্টি আমার কাছে সব সময় শীতের বৃষ্টির সঙ্গে মেশানো থাকত। তা ছাড়া, আগুনের ধারে বা রোদে না বসলে কোনো সময়েই আমার গরম লাগত না।

বিরাট একটা ধোয়া কাপড়ের বস্তা সাইকেলের হাতলের উপরে বেঁধে একদিন সোমবার সকালে সাইকেলে চেপে আমি ওয়াটার্কব্লুফ অঞ্চলের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। একে সকাল ; তার উপরে শীতকালের মাঝামাঝি। বেজায় ঠাণ্ডায় আমার সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। আমার গায়ে ছিল একটা পাতলা ধরনের ছেঁড়া ব্লেজার। মনে হল, আমার নাক, কান, ঠোঁট, পায়ের গোড়ালি আর হাতের আঙুলগুলি ফুলে শরীরের অন্যান্য অংশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু সেগুলি আমার দেহের এমন সব অংশ যেগুলি ঠাণ্ডা একেবারে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছিল।

একটা গোল জায়গার কাছে এসে আমি পৌছলাম ; ডান দিকে ঘুরে যাওয়ার কথা ছিল আমার ; কিন্তু গেলাম না ; পারলাম না। ভারি কাপড়ের গাঁট থাকার ফলে হাতলটাকে বাঁকানো গেল না। উলটো দিক থেকে একদল শেতাঙ্গ ছোকরা সাইকেলে চেপে আসছিল। তারা ঘুরে গেল ; ঠিক সেই সময় বাঁকের একদিকে আমি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা সবাই পাশাপাশি লাইন করে আসছিল। যে কোন কারণেই হোক, আমি আমার সাইকেলের ব্রেক কষি নি। হয়তো তখন ভাবছিলাম আমার সাইকেলের হাতলগুলি বাঁকানো সহজ ; অথবা, সেগুলিকে বাঁকানো যে খুব সহজ হবে না সেকথাও তখন ভেবে থাকতে পারি। ফলে, তাদের দলের একটি ছেলের সাইকেলের উপরে গিয়ে পড়লাম। সেই ধাক্কা সামলাতে না পেরে, ছেলেটি গিয়ে পড়ল আর একটি ছেলের গায়ে ; তাদের সেই লাইনটি হয়ে গেল ছত্রভঙ্গ। আমার সাইকেলটা ধাক্কা খেল একটা ঘোড়ার গাড়ির গায়ে ; আর মুহূর্তের মধ্যে আমি মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

যে ছেলেটা প্রথম পড়েছিল সে চিৎকার করে বলে উঠল : বেশ্যার বাচ্চা !

এগিয়ে এলো তার বন্ধুরা মারমুখী হয়ে। তাদের মধ্যে তিন জনে আমার পিঠে আর দাবনার উপরে লাথি মারল। তারপরে, গালাগালি

দিতে-দিতে তারা সাইকেলে চেপে চলে গেল। সেই ঠাণ্ডায় পড়ে রইলাম আমি। আমার শরীরটা তখন যন্ত্রণায় টনটন করছে। কথা বলার শক্তি নেই তখন। সাইকেলের সামনের চাকাটা দুমড়ে বেঁকে গিয়েছে তখন।

কাপড়ের গাঁটরিটা রাস্তার উপর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কোনোরকমে ফুটপাতের দিকে এগিয়ে গেলাম ; তারপরে, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। আমি এতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম যে প্রথম কিছুটা সময় আমি কোনো কথা বলতে পারি নি। আবার উঠে দাঁড়ালাম ; তারপরে, খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ছ-মাইল হেঁটে বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। আমার আণ্ট আর ঠাকুমা গজগজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত উম্‌পীর সাইকেলটাকে চাঙ্গা ক'রে তুললেন।

সেকেণ্ড অ্যাভিন্যুর নিচের দিকে দাঁড়িয়ে চাইনা বলল—'আবার বল', সাইকেলের ধাক্কা লাগার কাহিনীটা আবার আমি বললাম।

পাশের বাড়ির মোলোই হাসতে-হাসতে মন্তব্য করল—পাড়াগেঁয়ে ভূত কোথাকার!

বিদ্রূপ করে মন্তব্য করল রাতায়ু : কী ভেবেছিলি রে ? পিটারসবার্জের জঙ্গল!

রাতায়ু ছাড়া সকলের কাছে এটা একটা ঠাট্টার ব্যাপার ছিল। বাচ্চা লিঙ্কস দাঁড়িয়ে ছিল উদাসীর মতো। উদাসীর মতোই সে বলল—চোখ দুটো খুলে রেখে তোমাকে যে শহরে চলাফেরা করতে হবে এটাই হচ্ছে তোমার প্রথম শিক্ষা।

'ভূত' কথাটা আমাকে বেশ দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল। সে দুশ্চিন্তা করাও বন্ধ করলাম আমি। শুনেছিলাম পাড়াগাঁ থেকে যারা নতুন শহরে আসে তাদের পিঠেই এই তক্‌মাটা এঁটে দেওয়া হয়।

শনিবারের রাত্রি—অন্ধকার ভারি হয়ে চেপে বসেছে চারপাশে। রাস্তার আলোগুলি ইতিমধ্যেই জ্বলে উঠেছে। মারাবাস্তাবাদ বস্তিটিকে ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। বৈদ্যুতিক বাতিগুলির চারপাশে কয়েকটা পোকা ঘুরে ঘুরে উড়ছিল। শনিবারের রাত্রি। বস্তি অঞ্চলগুলিতে শনিবারের রাত্রি ঝিমিয়ে থাকে না। সবাই সজাগ থাকে সেদিন বিশেষ করে বাড়ির মেয়েরা।

এই রকম একটি শনিবারের রাত্রি ছিল সেদিন। রাত্রির অন্ধকারে একটি দুর্লক্ষণযুক্ত চিৎকার শোনা গেল। সামান্য একটুও টর্চের আলো কোথাও পড়ছে কিনা দেখার জন্যে আমি বাইরে পায়চারি করছিলাম। সেই টর্চের আলো যে কীরকম বিরক্তিকর এখন সেই কথাই আমি ভাবি। ব্যাপারটা

সব সময় এই রকমই ছিল। শনিবারের রাত্রি, টর্চের আলো ফেলা শনিবারের রাত্রিগুলি এবং পুলিশের হুইশিল। শনিবারের রাত্রি আর আর্ত চিৎকার। শনিবারের রাত্রি আর শ্বেতাঙ্গ পুলিশের ধমকানি আর অশ্রাব্য চিৎকার। প্রতিটি শনিবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত ; তবু সেটিকে সাধারণ অভিজ্ঞতার সামিল করার মতো কেউ এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করত না ; বা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনাহীন বলেও ভাবতে পারত না। আমার বয়স তো তখন মাত্র তেরো।

এক গ্যালনের একটা টিনের মধ্যে শেষ কয়েকটা পাইণ্ট বিয়র ঢেলে দেওয়ার কাজে আমার আণ্ট তখন খুবই কসরৎ করছিলেন। আমার কাজ ছিল উঠানের উপরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়া।

আমার উপরে সব সময় এই নির্দেশই থাকত ঃ 'যাও বাইরে পাহারা দাও, বৎস' ; 'অনেক নিচু করে একটা গর্ত খোল', 'বেশ শক্ত করে বুজিয়ে ফেল',—ইত্যাদি। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বারবার। মেয়েকে বলা হত ঃ বাছা, ইস্কুল ছেড়ে কাজ কর। তুমি কেবল ঘরে বসে থাকবে, আর সবাই তোমার জন্যে খাটবে এটা ঠিক কথা নয়। ওঠো, সাহেবদের পোশাক কাচো, বিয়র বিক্রি করো। ঠিক—হ্যাঁ, এই তো। এইভাবেই মেয়েরা কাজ করে ; আমাদের দিকে চেয়ে দেখ ; আমাদের স্বামী বা বাবারা একা একা কাজ করছেন দেখ। বিয়র বিক্রি করে ঘরে যে টাকা আসে তাই দিয়ে ছেলেমেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাই···

হ্যাঁ ; এইভাবেই চলতে হত—সব সময়। তোমরা বাস করছ সাহেবদের দেশে ; তাদের পোশাক কাচার কাজ তোমাদেরই করতে হবে। তার টাকা নিয়ে তারই রুটি কিনে আনতে হবে তোমাকে। সে তোমার জন্যে যে বাড়ি তৈরি করে দেবে সেইখানেই তোমাকে বাস করতে হবে। তোমাদের অঞ্চলের শান্তি রক্ষা করবে তারই পুলিশ···

অন্য টিনগুলি ইতিমধ্যেই তাদের নিজের নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। জানালার ভেতর দিয়ে শেষ টিনটা অবশ্যই এল ব'লে। আণ্টকে তাড়াতাড়ি করতেই হবে, অথবা···ভারি বুটের মশমশানি কানে এল আমার। পেল্লায় চেহারার দুটি লোক আমাদের উঠোনের উপরে লাফ দিয়ে পড়ল। একটা বড় টর্চের আলো চারপাশে কি যে খুঁজতে লাগল। মনে হল, উঠোনের প্রত্যেকটি খুদে জিনিসই পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা কোণের দিকে ঘোরার আগেই টিনটি আমার হাতে এসে পৌঁছেছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেটি নিয়ে আমি পাশের উঠোনের উপরে ছুঁড়ে দিলাম। কাদার উপরে একটা শব্দ তুলে সেটা চুপ করে গেল। শব্দ হওয়ার জন্যে

নিজের ওপরেই রাগ হল খুব ; কিন্তু সেটা যে নোংরা জলের ডোবার মধ্যে পড়েছে এই জন্যেই ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানালাম। ঠিক সেই সময়, একজন শ্বেতাঙ্গ আর একজন আফ্রিকান কনস্টেবল কোণের দিক থেকে ঘুরে আমার দিকে এসে আমার মুখের উপরে একটা খুব জোরালো টর্চের আলো ফেলল। ফলে, শ্বেতাঙ্গ পুলিশটির চওড়া কাঁধের পাশগুলিই আমার চোখে পড়ল। ভয়ে আমি কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাঁপতে লাগলাম।

বিশালবপু আফ্রিকানটি জিজ্ঞাসা করল ; 'এখানে কি করছিস রে ছোকরা ?' এই বলে সে তার সেই চোখ-বাঁধানো টর্চটা নিবিয়ে ফেলল।

'কিছু না।'

'তুই এখানে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছিস ; কিছুই করছিস না—বদমাস কোথাকার !'

চুপচাপ। সেই সময়েও মানস চক্ষে দেখতে পেলাম বাকি বিয়র আর বাসনপত্রগুলিকে লুকিয়ে ফেলার জন্যে মা ছুটাছুটি করছেন।

'আমি যখন এখানে এলাম তখন একটা শব্দ শুনেছিলাম। সেটা কিসের শব্দ ?'

বললাম ; 'একটা কুকুরকে লক্ষ্য করে আমি ঢিল ছুঁড়ছিলাম।' মায়ের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আমাকে সেইখানেই আটকে রাখতে হবে—এইটাই তখন আমার মনে হয়েছিল ; কিন্তু আমার কপালে যে কি ছিল তা তখন আমি ভাবতে পারি নি।

'যোনাস' এই বেশ্যার বাচ্চাটাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল।'

সেই কৃষ্ণকায় কনস্টবেলটা তখনও আমার হাত ধরে নি ; তার আগেই শ্বেতকায় একটি বিরাট হাত আমার গালে এমন একটা বিরাশী শিক্কার ঘুষি বসিয়ে দিল যে আমি কাঁপতে কাঁপতে আঙুর গাছের একটা শক্ত ঠেকার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে কৃষ্ণকায়টি আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। সেই ঝাঁকানি দেওয়ার ফলে গোটা শরীরটা আমার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল।

'শুয়োরের বাচ্চা, সত্যি কথাটা বলবি ?'

তখন আমার আর কোনো ভয় ছিল না। ভাবলাম, যা হয় হোক ; হাতের পেছনটা আমার মুখের উপরে রাখলাম। রাখার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরে একটা কি যেন নোনতা নোনতা-লাগল। আমি যখন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম সেই সময় সেই বিশালবপু শ্বেতাঙ্গটি আমার ঘাড় ধরে তার সেই বিরাট হাতের গায়ে চেপটে দিল। মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

'বদমাস, শুয়োরের বাচ্চা, মিথ্যে কথা বলার শাস্তি এই।' এই বলে সে আমাকে পেছনের দিকে ধাক্কা দিল। সেই ঠেলায় শক্ত মাটির উপরে আমি গড়িয়ে পড়লাম।

একটা ভয়ঙ্কর রকমের তীব্র আলো···বিয়রের টিন ছেঁদা করার জন্যে চকচকে ধারালো ইস্পাতের কাঁটা···ভারি-ভারি পদক্ষেপ···ইস্পাতের ঝনঝনানি···শব্দগুলি ক্ষীণ হয়ে এল···অসুস্থ বলে মনে হল আমার। মনে হল পৃথিবীটা ঘুরছে ; আর আমি তারই একটি প্রান্ত ধরে কোনো-রকমে ঝুলছি। আমার চোখের উপরে অন্ধকার নেমে এল···সব অন্ধকার, অন্ধকার···

বিয়র চোলাই করার কাজ মারাবাস্তাবাদে যথারীতি চলতে লাগল। সেগুলিকে উৎখ্যাত করার জন্যে একই রকম নির্দয় হামলা চলতে লাগল পুলিশের তরফ থেকে। শনিবার আর রবিবারের সকালগুলি রাস্তাগুলির উপরে বলতে গেলে বিয়রের স্রোত বইতে লাগল। ভারতীয় এবং চীনদেশীয় ব্যবসাদারদের বার্লির মদ তৈরি করে বিক্রি করতে বাধা দেওয়া হত না। প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে অনেক গর্ত থাকত ; সেগুলির ভিতরে লুকানো থাকত বিয়রের টিন। ফিফথ্ অ্যাভিন্যুতে একবার একটা বাড়ি পুড়ে গিয়েছিল। রাবিশগুলি পরিষ্কার করার পরে একটা মাটির চত্বরের উপরে কয়েকটা গর্ত দেখা গিয়েছিল। সেই গর্তগুলির মধ্যে কয়েকটা টিন ছিল। ধড়িবাজ ডকি দিব্যি দিয়ে বলেছিল সেই টিনগুলির মধ্যে পশুদের গোছা-গোছা লোম পাওয়া গিয়েছে। সে মন্তব্য করল—'বিয়রের ব্যবসা করে যারা টাকা লুটতে চায় এটা হচ্ছে সেই সব ডাইনীদের কাজ।'

ভদ্রমহিলার কথায় অনেকেই বিশ্বাস করেছিল। মেয়েরা মদ তৈরি করার সময় যে সব জিনিস মেশায় সেগুলি বড়ই মারাত্মক। আমার ঠাকুমা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বলতেন : 'একেবারে বর্বর ওরা! আমার বিয়র একেবারে খাঁটি, স্বাস্থ্যকর।' এবং আমাদের খদ্দেররা কোন দিনই মদ নিয়ে ঝামেলা বাধাত না। 'ঈশ্বর করুন, ওই মদ বিক্রি করে আমি যেন আমার ছেলেমেয়েদের কলেজের খরচা চালাতে পারি।' কলেজ বলতে তিনি বোঝাতে চাইতেন হাইস্কুল অথবা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার স্কুল। তিনটি ছেলের তিনি হাইস্কুল এবং একটি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার স্কুলের পড়ার খরচ চালাতে পেরেছিলেন।

শনিবারের রাত্রি ; অন্ধকার। কোণ্ থেকে কাকার নাক ডাকার শব্দ। মনে হবে যেন বোবা একটা গরু কাতরাচ্ছে। মেঝের উপরে তাঁর সঙ্গে আমার আর এক কাকা শোন। কাল সকালে তিনি অভিযোগ করবেন

যে তাঁর নাক ডাকার জন্যে রাত্রিতে তাঁর ঘুম হয় নি। আমার ছোটো ভাইটি আমার পাশে ঘুমোয়। সারা রাত্রি সে নড়েও না, চড়েও না। একই কম্বল নিয়ে তার ওধারে আমার আর একটি কাকা ঘুমোয়। সেও আমার ছোটো ভাইয়েরই মতো। সবাই বলে আমার ঘুম খুব খারাপ; এবং আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরেই আমাদের তিনজনের মধ্যে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। মেঝের উপরে যে কাঠের উপরে আমরা শুয়ে থাকি, আমি জানি, সেই কাঠের ফোকর দিয়ে ঠাণ্ডা এসে আমাদের খোলা দেহের চামড়ায় লেগে চাবুক মেরে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়; অন্যথায়, আমাদের মধ্যে একজনের পা এসে আমার গলার উপরে পড়ে; তখন আমি স্বপ্ন দেখি কোনো শয়তান যেন আমার গলাটাকে চেরাই করছে; এই দেখেই আর্তনাদ করে আমি লাফিয়ে উঠি। আমার বোন শোয় মেঝের উপরে টেবিলের নিচে। ঘুমোতে-ঘুমোতে টেবিলের পায়ের গায়ে সে লাথি ছুঁড়ছে। জোড়া খাটের উপরে আমার ঠাকুমা, আর কাকীমা ডোরা ছেলেমেয়েরা চুপচাপ শুয়ে রয়েছে। ঘরের একটি মাত্র দরজা আর একটি মাত্র জানলা বন্ধ। বেশ গরম লাগছে। ছেঁড়া দুটো কম্বলের মধ্যে গরম থাকতে ভালোই লাগে। আমার ঘুম আসে না; আমার দেহের হাড়গুলো কনকন করছে; বাইরের উঠোনে পায়চারি করার জন্যে বিছানা ছেড়ে ওঠার সাধ্য নেই আমার; আমি ঘরদোর পরিষ্কার করছিলাম; নাড়ানাড়ি করছিলাম জিনিসপত্র। তার ফলে যে সব ধুলো উড়ছিল তাতেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে আমার। মুখ থেকে ঝরছে নোনা জল। নাকের ভেতরটা সুড়সুড় করছে বলে নাক ঝাড়ছি আমি। না, কিছুতেই শান্তি নেই। কাঠের কড়ির উপরে চাপানো ছিল অনেক বাক্স-প্যাটরা, আর ঠাকুমার অকেজো সম্পত্তি। ধুলো থেকে কোনো দিনই পরিত্রাণ নেই তাদের। তারপরে মেঝের উপরে রাখা ওই বাক্সগুলি; ওগুলির মধ্যে পোরা রয়েছে কতগুলো পুরানো হাতব্যাগ, টুপি আর অল্পদামী কিছু অলঙ্কার—কবেকার কোন্ মহিলার দান—তাঁর নাম আমরা ভুলে গিয়েছি। সেগুলিকে উঁচু স্তূপ থেকে নিচে নামিয়ে আনার প্রয়োজন ছিল; কিন্তু ঠাকুমা তাতে রাজি নন। সেই গাদার পেছনে মাটিতে গর্ত করে লুকানো ছিল বিয়রের টিন; পচাই বিয়রের ফেনার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ; আর ছিল গর্তগুলির মুখের চারপাশের ধূসর রঙের দাগ। তাদের সহজে খুঁজে বার করার সাধ্য কোনো পুলিশের নেই। পুলিশ? শনিবারের রাত্রি। পুলিশের পোশাকধারীরা উঠোনের চারপাশে এখনও হয়ত ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মারাবাস্তাদের পশ্চিম দিকে—অনেক দূরে পুলিশের একটা হুইশিল শোনা গেল। কতগুলো কুকুর ডেকে উঠল।

উঁহু ; ওটা নিশ্চয় ফিফ্‌থ অ্যাভিন্যুতে। ভারি বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন! নিশ্চয়ই কেউ পুলিশের হাত ছিটকে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে! পুলিশ হাজত, আদালত, জেল। শনিবারের রাত্রি। দশটা বাজতে দশ মিনিট দেরি আছে। থানার বিরাট ঘড়িতে দশটা-বাজতে-দশ-মিনিটের সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি আমি শুনতে পেলাম। দশটা-বাজতে-দশ, দশটা-বাজতে-দশ, দশটা-বাজতে দশ। কৃষ্ণকায়দের রাস্তা থেকে বাড়ি ফেরার সময়, পুলিশের নাগালের বাইরে যাওয়ার সময়। বছরের পর বছর ধরে প্রতিটি রাত্রিতে ওই দশটা-বাজতে-দশ-মিনিটের ঘণ্টাধ্বনি বাতাসের উপরে ভেসে বেড়ায় ; কৃষ্ণকায়কে এই সময় তার নিজের বাড়িতে ছুটে পালাতে হবেই, ঘরে শুয়ে ঘুমোতে হবে তাকে, অথবা, অন্য কোথাও রাত্রি কাটানোর জন্যে বিশেষ অনুমতিপত্র নিতে হবে তাকে। খুব কাছেই হুইশিলের শব্দ শোনা গেল এখন। যে মানুষটিকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে নিশ্চয় এখন সেকেণ্ড অ্যাভিন্যুর ভিতরে এসে পড়েছে। কিন্তু ঘণ্টা বিপুল আবেগে বেজে চলেছে। সুতরাং হে কৃষ্ণকায়, তুমি যেখানেই থাকো, দৌড়ে বাড়ি ফিরে তোমাকে যেতেই হবে। ঘণ্টাধ্বনি মিলিয়ে গেল বাতাসে ; বন্ধ হল ঘণ্টা বাজা ; কিন্তু তবু আমি ঘুমোতে পারছি না ; আমার পিঠে যন্ত্রণা। যন্ত্রণার জন্যে চোখের ভিতর থেকে যে জল উপছে পড়ছিল তাকে বন্ধ করার জন্যে আমি চেষ্টা করছি। সেইজন্যে যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের টপকে দরজার কাছে এসে হাজির হলাম। দরজার মুখেই দশফুট বারান্দা। সেখানে এক ঘড়া জল ছিল। এক ঢোক জল খেয়ে আমি ফিরে গেলাম।

[The Location] অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

বাঙ্ময় বাতাস

জেমস এনগুগি

করঞ্জা তার কুঁড়ে ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। দৃষ্টি তার বহুদূরে—উঠোন পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে উপত্যকার ওপারের শৈলশ্রেণীর দিকে সে চেয়েছিল। মেয়েরা নদীতে জল আনতে যাচ্ছে। ছোট ছেলেরা গরু-ছাগলের পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে চরাতে। শৈলশ্রেণীর ওপারে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটি কুঁড়ে ঘর। তার বন্ধু এনজোরোগের ঘর। সেখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে রাশ-রাশ ধোঁয়া সর্পিল গতিতে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার কুঁড়ে ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে মাতালের প্রলাপ গুঞ্জন। তখন ভোর পেরিয়ে সকাল হতে অনেক বাকি, কাজে বের হবার সময় হয় নি তখনও। তবে সুরাপান করার পক্ষে অসময় নয়।

করঞ্জার কিন্তু তখন কিছু পান করার ইচ্ছে হল না। তার মন জুড়ে শুধু একটাই চিন্তা। সে ভাবছে আর মনে মনে আলোচনা করছে সেইসব ঘটনার কথা—শ্বেতাঙ্গ মিশনারিদের আগমনের পর গত কয়েক মাসের কথা। হ্যাঁ, তারা তাদের মাঝে এসে তাদের উপজাতির শৃঙ্খলা আর শান্তিতে ভাঙন ধরিয়েছে।

তারা নিয়ে এসেছে এক নতুন ধর্ম, যে ধর্ম তাদের মানুষজনকে প্রকৃত ঈশ্বর—সুবৃঙ্গু গিকুয়ু আর মামৃরি-র ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে যেতে শিক্ষা দিয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে নতুন এক রীতি-নীতির ধারা তাদের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই নতুন রীতিনীতি পুরাতন ধারাকে ভেঙে ফেলবে আর ঈশ্বরের চরম ক্রোধ তাদের সকলের উপর ডেকে আনবে। তাদের মেয়েদের আর ত্বকচ্ছেদ হবে না। যে মেয়ের ত্বকচ্ছেদ হয় নি তখন কে তার জন্যে ছাগল কিম্বা ভেড়া দিয়ে তাকে ঘরে তুলবে? প্রাচীন কালের গিকুয়ু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা চেগ কিবিরো না এই কথাই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন?···প্রজাপতির মতো কাপড় পরা এক জাতি

আসবে…। হ্যাঁ, মহান এক গিকুয়ু দ্রষ্টার এই ভবিষ্যদ্বাণী। এখন তা সফল হয়েছে, ঘটেছে সেই ঘটনা।

আমরা কি করব?—সেখানে দাঁড়িয়ে করঞ্জা অস্থির হয়ে উঠল। সহস্র চিন্তা তার মনে আনাগোনা করতে লাগল। অনন্ত শূন্যে ভেসে রয়েছে তার শূন্যদৃষ্টি, কিছুই দেখছে না সে, কোনো কিছুতেই মন নেই তার: ঠিক যেন দিব্যদর্শন দেখছে একটি মানুষ। সে দেখল, একটি উপজাতি, যার অস্তিত্ব ছিল একসময়। যে জাতির অপরিবর্তনীয়, অজেয়, অলঙ্ঘনীয় এক পবিত্র আচরণ-বিধি ছিল। উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং প্রথাগত সমস্ত অনুষ্ঠান এই উপজাতির মানুষকে নিখুঁত এবং দৃঢ় করেছে। তারা চাষবাস আর তাদের গরু ছাগল পালনের কাজে ব্যাপৃত।

ধীরে সে দেখল সেই উপজাতি আর পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, নতুন রীতিনীতির কাছে মাথা নত করছে তাদের লোকেরা। তার চোখের উপরেই, তার উপজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল, হয়ে গেল তার সমাধি। সেই উপজাতির আর চিহ্নমাত্র নেই—যা একদিন ছিল আজ তা আর নেই। দুর্ভিক্ষ আর মহামারী তাদের বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। আর তারই পায়ে পায়ে এসে অনুপ্রবেশ করল সাদা মানুষের ধর্ম আর তার সরকার। কেমন একটা ভয় তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করল। কাঁপতে লাগল তার সারা শরীর ভয়ে—কেমন একটা ভয়াতুর ভাব যা ঠিক ভয় নয়—এমন একটা অনুভূতি যা সে অনুভব করে নি কোনদিন।

'না! আমাদের সক্রিয় হয়ে উঠতেই হবে। যেতেই হবে সাদা মানুষটার কাছে—বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই ওকে হত্যা করতে হবে…।' শান্ত হয়ে এল তার মন। এখন তার সামনে পথ স্পষ্ট। উপজাতিকে সে বাঁচাবেই। সে-ই হল এর 'ত্রাণকর্তা'।

এক নতুন সঙ্কল্প নিয়ে সে আবার কুঁড়েতে ঢুকল। যে সমস্ত যোদ্ধা আর প্রবীণেরা তার কুঁড়েঘরে জমায়েত হয়েছিল তারা তখনও সুরাপানে ব্যাপৃত। তাদের মাঝখানে সকলকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে করঞ্জা। তার দীর্ঘদেহ পিছন দিকে ঈষৎ হেলানো, উজ্জ্বল দুটি চোখ অক্ষিকোটরের গভীরে সংলগ্ন। নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করঞ্জা ঘোষণা করল, নতুন ধর্মের অনুগামী হয়েছে যারা তাদের মৃত্যু অবধারিত। স্তব্ধতায় থম থম করতে লাগল কুঁড়েঘরখানি। তার কথায় সমর্থনের ক্ষীণ গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ সেখানে শোনা যাচ্ছিল না।

গুপ্তচরদের গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। লোকদের তারা ক্ষেপিয়ে তুলবে। যারা এখনও এই নতুন

বিপদের লক্ষণ দেখতে পায় নি তাদের তা দেখিয়ে দিতে হবে। নির্ধারণ করতে হবে বিচারের দিন কিন্তু সিরিয়ানা মিশন আক্রমণ করার আগে যারা উপজাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের পবিত্রতাকে দূষিত করেছে, অনুগামী হয়েছে নতুন রীতিনীতির, তাদের সরিয়ে ফেলতে হবে।

লটারি করা হল। নাম উঠল তারই বন্ধু এনজোরোগ-এর। সে-ই হবে এই যজ্ঞের প্রথম বলি। আর করঞ্জাকে আরও তিনজন যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সমাপন করতে হবে বলিদানের কাজ। না, তার শরীরের একটা পেশীতেও কাঁপন জাগল না। যে নতুন আদেশ সে জারি করেছে সেই আদেশের সম্পূর্ণ দাবি এবং মর্ম তার উপলব্ধির মধ্যে ধরা দিল। যে থামের গায়ে সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার কম্পিত হাতখানি সেই থামটিকে আঁকড়ে ধরল। এনজোরোগ তার বন্ধু—ছোট্টোবেলা থেকেই তাদের বন্ধুত্ব। বাল্যে তাদের দুঃসাহসিক অভিযান আর খেলাধুলায় যে সব জায়গাগুলিতে তারা একসঙ্গে কাটিয়েছে, পরস্পরের প্রতি গভীর আস্থায় গোপন কথার বিনিময়, সেইসব এবং আরও কত কথা করঞ্জার মনের উপর দিয়ে ভেসে চলতে লাগল যদিও তার নির্মম মুখখানা ছিল একেবারে ভাবলেশহীন।

কি সে করতে পারে? একই সঙ্গে বন্ধুকে বাঁচাতে আর তার উদ্দেশ্য—উপজাতিকে পবিত্র করার উদ্দেশ্য—কী করে সে সফল করতে পারে? দুটি শক্তি—বন্ধুত্বের মধুর বন্ধন আর তার উপজাতির জন্যে পবিত্র আহ্বান—তার মনে প্রাধান্য পাওয়ার জন্যে লড়াই শুরু করে দিল। কিন্তু তিষ্ঠ! সে কি এক উৎসর্গীকৃত 'পরিত্রাতা' নয়? কী করে সে তার কর্তব্য এড়িয়ে যাবে? পিতৃপুরুষদের আত্মার ক্রোধ নিবৃত্তির জন্যে তার প্রতি এ আহ্বানের দাবি এনজোরোগের রক্ত। এনজোরোগকে মরতেই হবে…।

গভীর রাত্রি। শুধু একটি মাত্র নক্ষত্র আকাশের অভিভাবক হয়ে জ্বলজ্বল্ করছে। আর সব অন্ধকার।

মৃদু গুঞ্জরিত ঝরণাধারা করঞ্জার বাসভূমি এনজাহি-ইনি শৈলশ্রেণী আর মুকোরো শৈলশ্রেণীকে যেখানে বিভক্ত করে বিরামহীন গতিতে বয়ে চলেছে সেইখানে একঝলক মৃদু হাওয়া ঝরণার পাড়ের শরঘাসগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। কোনো নড়াচড়া নেই, নেই কোনো শব্দ। এনজোরোগের জন্যে ওৎ পেতে থাকা চারজন যোদ্ধার নিঃশব্দ নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোনো প্রাণের সাড়া সেখানে নেই। রাস্তার একধারে বসে আছে করঞ্জা আর অন্য এক যোদ্ধা, অন্য ধারে অপেক্ষারত অন্য দু-জন। আক্রমণের ইঙ্গিত দেবে করঞ্জা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি মনুষ্যমূর্তির আবির্ভাবে সেই পটভূমির স্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। সে পর্যায়ক্রমে শিস্ দিচ্ছিল আর গান গাইছিল।

হে দিব্য জ্যোতি

এ ঘোর তমসায়

মোরে লয়ে চল…

এনজোরোগই—এনজোরোগ আসছে তার নিয়তির দিকে। বন্ধুত্বের আর্জিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্যে করঞ্জার হিংস্র, নির্মম সিদ্ধান্ত আর সঙ্কল্প যেন ঈষৎ দুলে উঠল। সে কাঁপতে লাগল আর তার সমগ্র হৃদয় তার জন্ম-মুহূর্তকে, যে ক্ষণে এনজোরোগের সঙ্গে তার হয়েছিল প্রথম সাক্ষাৎকার সেই ক্ষণটিকে, এবং যে সময়ে এসেছিল সেই সাদা মানুষটি, সেই সময়টিকে অভিশাপ দিতে লাগল। হয়তো সেই উপজাতি ছিল নির্মম—হয়তো তার হৃদয় ছিল না। কিন্তু তুমি কি করতে পার? তুমি উপজাতির বাইরে দলছাড়া হয়ে থাকতে পার না…। তার বহু বছরের এই বন্ধুকে চরম নিয়তির দিকে এগিয়ে দেবার চক্রান্তে উত্তেজিত করে যে বিশ্বাসঘাতকতা সে করেছে সেই কথা মনে পড়ায় এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল তার চোখ বেয়ে। মুহূর্তের জন্যে তার সংকল্প টলে গেল।

না! আক্রমণের ইঙ্গিত দেবে না সে। অন্যায়কে উপলব্ধি করার মতো হৃদয় তার আছে। এনজোরোগ মরতে পারে না। তাই সে এনজোরোগকে সাবধান করে দেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! একটা গোঙানির আওয়াজ তার রক্ত হিম করে দিল, আর এনজোরোগের শেষ আর্তকণ্ঠ মিশে গেল 'বাঙ্ময়' বাতাসে—তবু করঞ্জার মাথার মধ্যে সেই আর্ত-কণ্ঠ ধ্বনিত হতে লাগল বহুক্ষণ ধরে। অন্য দু জন যোদ্ধা বিনা আদেশেই তাদের কাজ সেরে ফেলেছে।

স্তব্ধ করঞ্জা তার বন্ধুর লম্বা হয়ে পড়ে থাকা দেহটির দিকে চেয়ে রইল দীর্ঘ সময় ধরে। দারুণ ভয় পেয়ে বসল তাকে, নড়তে পারল না সে।

'চল ভাই, আমরা যাই…।'

তার কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু কি করবে সে? ঝরণার ধারে ঝোপের মধ্যে তারা এনজোরোগকে কবর দিল। ক্লান্তপায়ে এগিয়ে চলেছে তারা বাড়ির দিকে, বাতাসও বইছে। তবু করঞ্জা শুনতে পাচ্ছে সেই কণ্ঠের সঙ্গীত, 'হে দিব্য জ্যোতি!' 'লয়ে চল, লয়ে চল', 'বাতাস বলে দেবে' 'লয়ে চল', 'বলে দেবে'—এইভাবে অল্পক্ষণের মধ্যেই গানটা একটা এলোমেলো অর্থহীন শব্দ সমষ্টির রূপ নিল—'বলে দেবে লয়ে চল বাতাস' —'জ্যোতি বলে দেবে'…।

ঘুমোতে পারল না সে। গরুর মোলায়েম চামড়া দিয়ে মোড়া ঘাসের তৈরি বিছানায় সে এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। মেটে দেওয়ালের দিকে সে পাশ ফিরল। সব বোবা। কোনো সান্ত্বনা নেই। সে চোখ বুজতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সমস্ত চিন্তা ভাবনার দুয়ার বন্ধ করে নেশাচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু একটা চিন্তা সমানে তাকে যন্ত্রণা দিতে থাকল। তার বন্ধু এনজোরোগে মারা গেছে আর করঞ্জাই সেই পরিকল্পনার স্রষ্টা যা তার বন্ধুর জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়েছে। এই কি তার উপজাতির পরিত্রাণের পথ ?

তারপর তার মনে উদয় হল এক নতুন ভাবনা। তার পরিকল্পনা দিয়ে কিছু হবে না। এ শুধু আনবে ধ্বংস, তার উপজাতির সম্পূর্ণ বিনাশ। সে তার উপজাতির পরিত্রাতা নয়, একটি উপজাতির পরিত্রাতা সে হতে পারে না। কারণ সে নিজেই কি উপজাতীয় সংস্কার ভঙ্গ করে নি, যে সংস্কারের দাবী ন্যায় বিচার, নির্দোষ রক্তপাত নয় ? সেই দ্রষ্টা চেগ-এর কথাগুলি কি ছিল ?

'···রক্তপাত, নির্দোষ রক্তপাত থেকে সাবধান। অন্যায়কারী খুনীর ওপর সুবুঙ্গুর মহাক্রোধ বর্তাবে··· ।'

হ্যাঁ এবং সেই হল সেই-জন। যদিও সে এনজোরোগকে হত্যা করে নি, তাহলেও এ ঘটনা ঘটেছে তারই জন্যে। তার বিশ্বাসঘাতকতায়, তারই সৃষ্ট প্ররোচনায় ঘটেছে সেই রক্তপাত।

'ওহ্, আমি কি করব ? আমার উপজাতিকে আমি রসাতলে দিলাম··· ।'

সহস্র ভাবনা তার মনে যাওয়া-আসা করতে লাগল। তার স্বজনদের কাছ থেকে, তার এমবেরি গোষ্ঠীর কাছ থেকে, এবং তার উপজাতির কাছ থেকে তাকে পালাতে হবে। সে তার উপজাতি ও তার ধর্মীয় সংস্কারের কাছে সে মূর্তিমান অভিশাপ।

বাতাস বইতে লাগল। প্রথমে ধীরে, তারপর বাড়তে লাগল তার গতিবেগ। জোরে, আরো জোরে। সাংঘাতিক ভাবে ধ্বসে পড়ার মতো আওয়াজ শোনা যেতে লাগল বাতাসের গর্জনে। তার কুঁড়েঘরের ছাউনির একদিকটা বাতাসে উড়ে গেল।

প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হতে লাগল বাতাসের বেগ। তার গর্জনে সমস্ত আওয়াজ ডুবে গেল, শুধু সেই একটিমাত্র সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত ছাড়া—অতি মধুর, স্পষ্ট। গানের কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত সেই স্বর উচ্চ থেকে

উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগল। গানের কথাগুলি করজার শিরা-উপশিরার রক্তধারাকে হিম করে দিল। এর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মেঝের ওপর সে বসে রইল তবু শুনতে পেল এনজোরোগের সঙ্গীতমুখর কণ্ঠস্বর—হে দিব্য জ্যোতি···কিন্তু না। এ শুধু এনজোরোগের কণ্ঠস্বর নয়। সহস্র কণ্ঠ তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তারা সকলে মিলে গাইছে, 'হে দিব্য জ্যোতি, লয়ে চল···'

এ স্থান তার জন্যে নয়। তাকে পালাতে হবে এখান থেকে। নিজের তরবারি সঙ্গে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল আর তারপর দৌড়তে আরম্ভ করল। দৌড়তে লাগল ঊর্দ্ধশ্বাসে। সেই মিলিত কণ্ঠস্বরও অনুসরণ করতে লাগল তাকে। যত জোরে সে দৌড়য়, বাতাসও তত জোরে বয়, সেই সহস্র কণ্ঠও তার কাছাকাছি হয় যতক্ষণ না গানের সব কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে একটিমাত্র 'জ্যোতি' শব্দে পরিণত হয়। তখন সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি জাগে যে গিকুয়ু-এর ঈশ্বর এবং মাম্বি হলেন জ্যোতির ঈশ্বর—অন্ধকারের নয়। গিকুয়ু উপজাতীয় সংস্কার পবিত্রতা, আলো ও শান্তির পৃষ্ঠপোষক—রক্তপাতের নয়। সে তখনো ছুটে চলেছে দ্রুতবেগে পাহাড়ের নিচে ঝরণার দিকে যেখানে তারা এনজোরোগের দেহ সমাহিত করেছে।

সে যে কি করতে চায় সে নিজেই জানে না। তবু সে ঐ মৃতদেহটি কাঁধে নিয়ে ঝরণার পাড় দিয়ে দৌড়তে লাগল। সে দৌড়চ্ছে, হাঁপাচ্ছে। এমনি করে সে এল একটা উঁচু পাড়ের ওপর, ভাবল, সেখানে একটু বিশ্রাম নেবে। তারপর সে যাবে মিশনে, 'তাদের' লোকের মৃতদেহ তাদের দিয়ে দেবে। কিন্তু সে নিজে তাদের সাহায্য পেতে চায় না। সে জ্যোতির সন্ধান পেয়ে গেছে। সে যাবে সরকারি প্রহরা কেন্দ্রে···। সে এবং ঐ মৃতদেহ উপজাতির পক্ষে অভিশাপ বিশেষ।

বসে আছে সে সেখানে, আর 'জ্যোতি' শব্দটি একাদিক্রমে বেজে চলেছে তার মনের মধ্যে, হৃদয় তার গান গেয়ে উঠতে চাইছে। সে চেষ্টা করল—'হে দিব্য জ্যোতি···' কিন্তু কে!

তার উপজাতির ঈশ্বর, শ্বেতাঙ্গ মিশনারী অথবা সাদা মানুষের সরকার?

'কে ওখানে?' জিজ্ঞাসা করল একটি কণ্ঠস্বর। একেবারে অপ্রত্যাশিত ভাবে। নিদারুণ ভয়ে ঘামতে লাগল সে, তাড়াতাড়ি দেহটা তুলে নিয়ে আবার সে দৌড়তে লাগল। হঠাৎ ফসকে গেল তার পা, ছিটকে পড়ল সে একেবারে নিচে—তারপর অন্ধকার। তার কাছে থেমে গেল বাতাস, থেমে গেল কণ্ঠস্বরের অনুরণন···।

মিশনারী মিস্টার গেরার্ড সেই ছিটকে পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। যে-ই পড়ুক না কেন, ওখানেই তার শেষ। কারণ বিখ্যাত মুকার্ড পাহাড় থেকে নিশ্চয়ই সে পড়ে গেছে। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি খুবই ক্লান্ত। এনজোরোগের গ্রামে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। যাই হোক, সকালেই আবার তিনি ফিরে আসবেন।

[The Wind] অনুবাদ : দীপালি রায়

অ্যানড্রু

রিচার্ড রাইভ

মিলনার আদালতে বিরতিকক্ষ তখন শূন্য হলেও, তার ভেতরে আলো জ্বলছে। তাড়াতাড়ি সেই ঘরে ঢুকে অ্যানড্রু বেশ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। অ্যাবের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তার মেজাজটা খুশি খুশি হয়ে উঠল। মনের দিক থেকে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে সে গুণ গুণ করে, 'হু', বেশ বলেছে, ছোট্ট কালো বলিবর্দ' গানটা গাইতে লাগলেন। সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য ছোকরা। কৃষ্ণকায় ক্ষুদে বলিবর্দটি মাঠের দিকে চলে গেল। তবু সেখানে যে সব শ্বেতবর্ণ। অ্যানড্রুর মনে হল অ্যাবের সঙ্গে কথা বললে মনে বেশ জোর পাওয়া যায়। জীবেরা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে সাবধান হওয়া দরকার—রাত্রি দশটার সময় কোনো কুমারী শ্বেত যুবতীর ঘরে কৃষ্ণকায় মানুষেরা সাধারণত ঢুকত না। হু', ক্ষুদে কালো বলিবর্দটি তৃণভূমি ছেড়ে আরো অনেক নিচে নেমে গেছে।

অ্যানড্রু ১৯ নং ফ্ল্যাটে পৌঁছে একটু হতাশ হল। ঘরটা অন্ধকার। এদিক-ওদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ল দরজায় আটকানো একটা চিরকুটের দিকে। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে। চিরকুটটা হাতে নিয়ে পড়ল, 'প্রিয়তম অ্যাণ্ডি'—সে অবাক হয়ে ভাবল সে তাকে সব সময় অ্যাণ্ডি বলে ডাকে কেন? 'ঢোকার দালানে আমার চিঠির বাক্সটা দেখো।' চিরকুটটা সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুড়ে পকেটে রাখল।

তারপর সে চিঠির বাক্সে একটা খাম পেল। খামের উপর তার নাম লেখা। খাম থেকে চিঠিটা বার করে পড়ল, 'অ্যাণ্ডি, আমার কাছে দু জন পলিটিক্যাল দপ্তরের লোক এসেছিল। তারা আমার অনেক ব্যক্তিগত ব্যাপার জানতে চাইল। আমি ন-টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম তোমার জন্যে। তারপর ভাবলাম গ্র্যাসী পার্কের কাছাকাছি তোমাকে পাওয়া যায় কিনা একটু

চেষ্টা করে দেখি। যাই হোক, পাছে আমাদের দেখা না হয় এই জন্যে এই চিঠিটা রেখে গেলাম। এই সঙ্গে চাবিটাও দিলাম। তুমি এখানে—মানে আমার ঘরে অপেক্ষা কোরো, আমি না আসা অবধি। ইতি, রুথ'।

হুঁ, তাহলে বেজন্মাগুলো ওর কাছেও ধাওয়া করেছে। কিন্তু এত হৈ চৈ করার দরকারটা কি? তার সমস্ত আনন্দ মুহূর্তে উবে গেল। অভিযোগ আর অত্যাচারের জগতে আবার সে ফিরে গেল।

সকলের অগোচরে সে কক্ষে প্রবেশ করল। সুইচ টিপে আলো জ্বালল। রুথ এই ঘরে বসে, শোবার ঘরও তার এইটাই। বেশ সাজানো. গোছানো সুন্দর রুচিপূর্ণ। দেয়ালে ঝুলছে সেকোটো আর ইরমা টার্নেসের ছবি। ঘরের একপাশে লম্বা করে সাজানো তার বইপত্তর। ডঃ ডুবোইজ দাসপাঁশা গোর্কি, সেটইন্ বেক; হাওয়ার্ড ফাস্ট। চমৎকার কোচ বসতে আরাম লাগে। তার পাশেই রয়েছে রেকর্ডপ্লেয়ার। কোচের উপর রঙিন বালিশের ছড়াছড়ি। ঘরের ফে্রঞ্চ দরজা দিয়ে ওপাশে ব্যালকনিতে যাওয়া যায়। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে চোখে পড়ে, সামনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদ, আর পর্বত। এই ঘরের ওপাশে রান্নাঘর আর নীল টালি দিয়ে ছাওয়া স্নানঘর।

সে ঠিক করল প্রথমে একটু জিরিয়ে সে স্নান করে ফেলবে। তারপরে ঘাড় আর ক্লান্ত শরীরে জল ঢালল। সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল একটা আরাম। স্নানঘরে ঝরণার নিচে মুখ তুলল অ্যান্ড্রু। ঝরণা নিঃসৃত জল এসে তার মুখের উপর পড়তে লাগল। তাই ভেবে অবাক হল সে। তারা সত্যিই তার পিছনে বড় লেগেছে। প্রথমে গ্রাসী পার্কে, তারপর এখানে। শয়তানরা যে কি চায়। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে বলে? তারা কি ভাবে এটা অন্যায় কাজ? শ্বেত বালিকাকে ভালোবাসা কি অন্যায়? এতে কি তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে? নাকি পি-এ-সি ক্যাম্পেনের কোন হোতা? হুঁ, দেবতারা যাকে ধ্বংস করবে বলে ঠিক করে তাকেই প্রথমে তারা পাগল করে দেয়। ঘসে ঘসে সে শরীরের জল মুছে নিল। আর তার পরেই সে বুঝল, তার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। সারা দিনে একটা দানা তার পেটে পড়ে নি। এলোমেলোভাবেই এ্যান্ড্রু রুটি কাটল, কফি গরম করল, ডিম ভাজার জন্যে তাওয়া গরম করল। না তিনটে না, দুটো ডিম নিল। রেফ্রিজারেটরে কিছু টম্যাটো ছিল সেগুলো নিয়ে কুচি কুচি করে কাটল। তারপর খেতে বসল। দেয়ালে কংগ্রেসের একটা নোটিশ ঝুলছিল, নোটিশটা বিবর্ণ। জাতীয় নিয়ন্ত্রিত মালপত্তর বয়কট করার আবেদন। তারই নিচে কোন কোন জিনিস বয়কট করা উচিত তাদের তালিকা।

খাওয়া-দাওয়ার পর সে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। তৃপ্ত ও সুস্থ হওয়ার পর ওদিকের আসল ঘরে গিয়ে সে বুথের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। দরজার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওপাশে বিশাল টেবল পাহাড়ের সুবিস্তৃত ছায়াঘন পটভূমি, সেই পটভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোগুলি জ্বলজ্বল করছে। জেমিশন হল, আর রেসিডেনাসগুলির বিন্দু বিন্দু আলো পাহাড়ের গায়ে জ্বলছে।

সে নিজেই ব্র্যাণ্ডি ঢালল। সোডা মেশাল। কোচের উপর অপঠিত আরগসি দেখল। কিন্তু ওটা যে পড়বে, তেমন মনের অবস্থা তার ছিল না। গান-টান কিছু হবে নাকি? হুঁ, হলে মন্দ হয় না। রেকর্ড প্লেয়ারটার পাশেই রেকর্ড রাখবার জায়গা। স্মেতানা। একসময় সে ওসব জানত। ম্যাভ্‌লাস্ট থেকে মলডাউ, আমার দেশ! দেশাত্মবোধক গান, জাতীয় চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার মতো। দারুণ প্রিয় ছিল তার।

সে উঠে এসে ফরাসী কায়দায় নির্মিত দরজাটা খুলে দিল। পাইন গাছের ঘ্রাণ নিয়ে এল মৃদু বাতাস। ফিরে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় বসে অ্যান্ড্রু রেকর্ডপ্লেয়ার চালিয়ে দিল। তারপর ঘরের সমস্ত আলো নিবিয়ে দিল। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে সে কোচের উপর বেশ গা ছড়িয়ে বসল। ঠিক এমনি করেই সে অ্যাবের ঘরে রেকর্ডপ্লেয়ার বাজাত। হুঁ, কোথায় যেন সে পড়েছে স্মেতানা, লিসৎ-এর মতোই একটা সিদ্ধান্তে এসেছে, সময়ের মননশীল গতি প্রকৃতির দ্বারা সঙ্গীতকে সংবেদনশীল করে তোলা যায় এবং সঙ্গীত ইয়োরোপকে নতুনতর ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। কি অদ্ভুত পণ্ডিত আর জ্ঞানী।

'হ্যাঁ মশাই' অ্যাবে প্রায়ই বলত, সত্যিকারের দক্ষিণ আফ্রিকার নিজস্ব শিল্প শৈলীর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা যে জিনিসটার প্রয়োজন বোধ করছি, তা হল, দেশীয় সংস্কৃতিগুলির সম্যক্ উন্নতি।

দুটি একক বাঁশী—সুমাভা জঙ্গলে উঁচুতে অবস্থিত কোনো উৎস থেকে বেরিয়ে আসা মলডাউ নদীর ধারার সঙ্গেই যার একমাত্র তুলনা চলে। হুঁ, এর প্রতিটি অংশ সে জানত, প্রতিটি যন্ত্র সে চিনত, চিনত প্রতিটি স্বরগ্রাম। কিন্তু স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ থেকে ছুটে পালানোর সময় এই সমস্ত অগ্নিকাণ্ড আর দাঙ্গাবাজির মধ্যে নতুন সন্ধান করা লক্ষ্যের, উঃ কী বীভৎস ব্যাপার! এ যেন সেই এক দিকে রোম পুড়ছে, আর এক দিকে বেহালা বাজছে। যেন অরণ্য আনন্দোৎসবের উচ্ছ্বাস সেই সুরের মধ্যে উথলে উঠছে। বিবাহোৎসবে নৃত্যরত গ্রাম্য নরনারী সঙ্গীত মুখর। ওদিকে মেটল ডাউয়ের সবুজ তীরভূমি, শার্পভিল আর ল্যাঙ্গার শুষ্ক পত্রে আকীর্ণ। আর সেই সময়ে সে অপেক্ষা

করছে একটি শ্বেত-বালিকার জন্যে, যাকে সে সমস্ত ইন্দ্রিয় আর আবেগ দিয়ে ভালোবেসেছে। সেখান থেকে বুথকে নিয়ে গেছে সে প্রাণের মধ্যে দিয়ে ভাইস্র্যাডের কাছে, যেখানে নদী আরো বিস্তৃত হয়ে উঠেছে। বিস্তৃত আর দুর্বার। ল্যাঙ্গা শবদাহকালে যেমন ভিড় জমে, তেমনি উত্তাল জনতার মতো নদীর এ তীরে ও তীরে অনেক কৃষ্ণকায় মানুষের ভিড়। অটুট নৈঃশব্দের মধ্যে সেই সব মুখে ছাপ পড়েছে অনেক সম্ভ্রমবোধের, ভয়ঙ্করও তাদের কম দেখাচ্ছে না। হ্যানোভার স্ট্রিটের লেক, যেখানে সবাই সাঁতার কাটে তার মতোই গভীর আর নিতল।

এবং তারপর সেণ্ট জোহানের উপর মালদাউ নদীটি যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তেমনি করেই তার সাহস আর উত্তেজনা বেড়ে যায়। বেশ শান্ত ছিল, হঠাৎ যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। চমকে ওঠে, ভীষণ হয়ে ওঠে, অনেকটা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা জনতার মতো। ছাড়পত্রগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে পুড়িয়ে দেয়। তার শিরায় শিরায় গর্জে ওঠে। সাউথ ইটারে টেন্যাট্ স্ট্রিট কর্ণারের অনর্গল কলরোল যেন। নাকি তার মায়েরই ক্রোধ। অবশ্যই তার উপর দোষারোপ করা যায় না। সে রাগ সামলে নেয়। তের বছর আগে কোনো-এক ঝড়ের দিনে তার মৃত্যু হতে পারত অনেক দিন আগে, অনেক দিন আগে। হুঁ, ছোট্ট কালো বলদটা তৃণভূমে গড়িয়ে গেছে অনেক আগে, অনেক আগে। এখনো তার নাকে লেগে আছে ঝরে পড়া শাক-সব্জি, ঘাস আর মদের গন্ধ। ৬নং জেলা। ম্যাভলাস্ট্। আমার দেশ! জাতীয় গল্পের উপর নির্ভরশীল, একটা চমৎকার বিস্তীর্ণ বীরত্বপূর্ণ ভাব যা গানের মধ্যে দিয়ে শোনা যায়। ব্র্যাণ্ডিতে আর একটু সোডা দরকার। আঃ, বুথ এখনো ফিরে এল না কেন? আশ্চর্য! মিসেস ক্যারোলিন সেন তাকে যে কি বলবে! সঙ্গীত আরো ছন্দায়িত ও সুরময় হয়ে ওঠে, দীর্ঘ এক ধুয়ায় বিলসিত হয়ে চলে যায় দূরে, সেই শেষ প্রান্তে যেখানে স্রোতস্বতী উদ্দাম হয়ে মিশে গেছে অর্ণবের বুকে। অনেক, অনেককাল আগে। সেই সময় সেই ছোট্ট কালো বলদটা সেই তৃণভূমের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সে অনেক দিন আগের কথা।

[Andrew] অনুবাদ : অমিয় চৌধুরী

এক জোড়া হাত

লিনো লিটাস

নিজের হাতদুটিকে খুব ভালোবাসত মহিলাটি। তার পূর্ণ যৌবনে সে দু চোখে কোমল উত্তাপ নিয়ে ঐ হাতদুটিকে দেখত। খুবই সুন্দর ছিল তার হাত দু খানি—মসৃণ আর স্বচ্ছ। হাতের উপরে আঙুলগুলি দেখাতো দীর্ঘ মোমবাতির মতন—এত সুন্দর যেন স্বর্গীয় বীণার উপরে সুরেব মূর্ছনা জাগিয়ে তোলার জন্যে সেগুলোর সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু অনেকদিন আগের কথা। এ-সব আর এখন তো কতবছর সে তার হাতদুটির দিকে সেই শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে তাকায় নি। তার প্রয়োজনে সে তার হাতদুটিকে ব্যবহার করত কিন্তু তারপরে আর কখনোই তাদের কথা ভাবত না। যেন কোনো অস্তিত্বই ছিল না তাদের। আর যদি সে ব্যবহার করত, তাহলে তার মধ্যের সেই অগাধ শূন্যতা তাকে যেন আরো ব্যথা আর দুঃখে ভরিয়ে তুলত। যে-সব জিনিস আমাদের অন্তরকে সুখে ভরিয়ে তোলে প্রায়ই তারা আমাদের মধ্যে এনে দেয় অসহনীয় বেদনা। সুখ আর যন্ত্রণা, প্রেম আর দুঃখ, লাভ আর ক্ষতি, সন্তুষ্টি আর তিক্ততা পাশাপাশি পথ হাঁটে—যেন যমজ ভাই। জীবনে প্রথম যা আসে তার উপরেই নির্ভর করে সব কিছু। প্রথমে যদি সুখ আসে জীবনে, তা চিরস্থায়ী না-ও হতে পারে—পরে তা হয়তো বেদনার ক্ষত সৃষ্টি করে। আর সেই বেদনায় জ্বলতে হয় বেশি কারণ সুখের মর্ম ইতিমধ্যেই আস্বাদিত। ঐ বেদনা সুখের আর এক বহিরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। একই নিয়মে প্রথম জীবনে প্রেম এসে যদি অসহনীয় বেদনায় ভরিয়ে দিয়ে চলে যায় তবে ঐ বেদনাই সেই মূর্ত প্রেমের নামান্তর, ঐ যন্ত্রণা, ঐ ব্যথা যা অন্তরের

মধ্যে দাবানল সৃষ্টি করে সে তো সেই প্রেমেরই ভাবমূর্তি। আর তাই সন্তুষ্টি আর তিক্ততা, লাভ আর ক্ষতির মিশ্রণেই প্রেম।

অনেক অনেক দিন আগের মতো সে তার হাতদুটির দিকে তাকাল। কিন্তু কেন যে তাকাল তা সে জানতো বলে মনে হল না। যে-সব জিনিসকে এককালে আমরা ভালোবাসতাম, যে-সব জিনিস এককালে আমাদের সুখ দিত, তাদের প্রতি চিরকাল আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। আমাদের অনুভূতিগুলোকে তাদের সঠিক পথে না চলতে দেয়ার জন্যে আমরা অনাসক্তির বাঁধ তৈরি করতে পারি। কিন্তু একদিন সে বাঁধ চুরমার হয়ে যায় আর আমাদের অনুভূতিগুলো খুঁজে পায় তাদের সঠিক পথ।

দুটি সমান্তরাল বাহুর মতন তার হাতদুটি টেবিলের উপরে রাখা ছিল। বেশি না হলেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে তাদের। দু হাতের মধ্যে ছিল এক কাপ চা। তখন চা-পানের সময়। ধীরে ধীরে তার চোখে এল সেই পুরনো উত্তাপ। তার অন্তর ফুলে উঠল আর আস্তে আস্তে নদীতে জোয়ার আসার মতন তার চোখের কোণে নেমে এল অশ্রু। ঝাপ্‌সা চোখে সে তাকাল তার হাত দুটির দিকে আর ধীরে ধীরে টেবিল থেকে ডান হাতটা তুলে তা দিয়ে বোলাতে লাগল তার বাঁ হাতটাকে। এত কোমলভাবে বোলাতে লাগল সে যেন অসহায় শিশু, মার কাছে সান্ত্বনা পেতে এসেছে। এক ফোঁটা অশ্রু পড়ল ঐ হাতের উপরে। তার ঐ হাতগুলির মধ্যে ছিল এক নিবিড় ইচ্ছা। যন্ত্রণায় কৃশ হয়ে গিয়েছে হাতদুটি। ফেলে আসা দিনগুলির পুরনো সুর বাজাবার জন্যে তার আঙুলগুলো খিমচে ধরল তার হাতদুটিকে। কিন্তু সুর যে বাজাবে বীণা কোথায়? তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে বাঁ হাতের উপরে পড়ল। বিষাদ-মাখা দৃষ্টিতে সে তাকাল সেই দিকে আর তারপর যথেষ্ট কোমলতার সঙ্গে সে মুছে দিল সেই অশ্রু।

তারপর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াল। যেখানে বসেছিল সেখান থেকে জানালার বাইরে সে তাকাল। সে দেখল বিবর্ণ নীল পাহাড় আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে আর আকাশ ও পাহাড়ের মাঝে থমকে আছে কালো মেঘ। সে ভাবল তার হাতদুটির মতন ওই পাহাড়গুলো যেন পৃথিবীর দুটি হাত আর তারা যেন ক্রন্দসী আকাশের অশ্রু মোছাচ্ছে। অন্তর্দৃষ্টিতে অতি পরিষ্কার ভাবে এই ছবিটি দেখতে দেখতে সে ভাবল যদি পাহাড়গুলো আকাশের অশ্রু না মোছায় তবে কি তাদের জন্যে আকাশ দুঃখ করবে। তার হাতদুটির মধ্যে এমনই এক বিরক্তিকর অভিলাষ ছিল যে তারা যেন ঐ চোখ-দুটির জল মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করত। কিন্তু কার চোখ?

যেন বহুদিন আগের কথা—তখন তার পূর্ণ যৌবন। তার হাতদুটো সেদিন জনৈক যুবকের করুণ আঁখি থেকে জল মুছে দিত। তার ঝাপসা চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই যুবকের ছবি। সে দেখতে পেল—যুবকটির আগমন প্রতীক্ষায় সে কেমন অধীর চিত্তে অপেক্ষা করত। দরজায় শব্দ হলেই সে বুঝতে পারত কে ঘা দিচ্ছে। তার পায়ের শব্দের সঙ্গেও তার ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাই দরজায় ঘা পড়তেই অথবা তার পায়ের শব্দে সে যেন ডানায় ভর করে ছুটে যেত দরজা খুলে দিতে। দরজা খুলেই সে ব্যাকুল চোখদুটি তুলে ধরত তার দিকে আর যুবকটিও দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সমান ব্যাকুলতা নিয়ে তাকিয়ে থাকত তার দিকে। তারপর অজ্ঞাতসারে মহিলাটির হাতদুটি এগিয়ে যেত তার প্রেমিকের দিকে আর ফুলের পাপড়িতে হাত দেবার মতোই তার সুদীর্ঘ আঙুলগুলো ছুঁয়ে ফেলত যুবকটির চিবুক। কিন্তু তার মনে হত যে সে বুঝি অতি সন্তর্পণে তার প্রেমিকের জীবন-বীণায় হাত বুলোচ্ছে। তবে তাতে ঐকতান তুলতেও সে জানত। নিজের সুরও তার কানে আসত। সেটা ছিল স্বর্গীয়। এত আমেজ থাকত তাতে যে মেঘের মতন তার অন্তর অতিক্রম করে তার চেতনার তুষারমণ্ডিত শীর্ষদেশ স্পর্শ করত সেই সুর। সেই সুরের উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠা তার চেতনা তার প্রেমিককে দিত আনন্দের আতিশয্য। সে কিছু চুম্বন এঁকে দিত যুবকটির ঠোঁটে আর চোখে। উভয়েরই রূপান্তর হত। ক্ষীণ জ্বলন্ত অঙ্গারের পরিবর্তে একটি সুন্দর মণির মতো তারা শোভা পেত নিরেট অন্ধকারের মধ্যে—পরস্পরের মধ্যে তারা এক অখণ্ড প্রোজ্জ্বল দীপ্তি দেখতে পেত।

প্রায়ই তার হাতদুটি যেত তার প্রেমিকের মাথায় আর একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে যথেষ্ট অনুরাগে অতি সুন্দরভাবে তার চুলের মধ্যে হাত বোলাত আর তার প্রেমিকও শিশুর মতো, যেন তার প্রেমিকার নিজের সন্তানের মতো, তার বুকে মুখ গুঁজত আর তার হাতদুটি স্বচ্ছ পবিত্র প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার প্রেমিককে আদর করত। তার প্রেমিকের চোখের জলে তার বুক ভিজে যাবার ব্যাপারে সে খুব সতর্ক থাকত। প্রেমিকের মাথাটা শান্তভাবে তুলে সে দু হাতে ধরত। তারপর কোমল দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে মৃদু স্বরে বলত, কাঁদছ? কেন?

প্রেমিক কোনো কথা না বলে তার দিকে তাকাত। কিন্তু সে এই না-বলা-কথা বুঝতে পারত, যেন কানেও শুনত—'তুমি আমাকে নির্মল করেছ।'

তখন তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সত্যিই সে যেন দেখতে পেত—ফেনিল জলের

বুদ্‌বুদে ভরা তার হাত দুটি যেন দুটি ঝরণার মতন তার প্রেমিকের চেতনাকে নির্মল করতে, পাহাড়ের চূড়ার বরফের চেয়েও শাদা করতে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর তার হাতদুটি দিয়ে তার প্রেমিকের চেতনার পাদদেশে জলপ্রপাতের মতন তার সমস্ত অনুভূতি আত্মসমর্পণ করত। আর তখনই দু জনের জৈবিক প্রেরণা মিশে যেত শ্বেত শুভ্র এবং প্রদীপ্ত এক বিশাল অখণ্ড প্রপাতে। সে অনুভব করত যে এত উঁচু থেকে সেই কামনার প্রপাত পড়ছে যে তল দেখা যেত না। সে শুধু দেখত যে অতল শূন্যতার গর্ভে সেই কামনা মিশে যাচ্ছে। আর সে তার প্রেমিককে জড়িয়ে আরো নিবিড় করত, একেবারে তার বুকের কাছে আনত। সে তাকে আদর করত, সোহাগ করত, পাছে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কামনার প্রপাতের মধ্যে সে শুনতে পেত তার সুর, যে সুর তার নিজের দৈহিক অস্তিত্বের কথা ভুলিয়ে দিত, যেন কোনোদিন তার মানবীর দেহ ছিল না। সে আরো অনুভব করত যে তার প্রেমিকের কোনোদিন শরীর বলে কিছু ছিল না। সে দেখতে পেত মধুর সোনালী জ্যোৎস্নায় তারা পরিবর্তিত হয়েছিল, দুটি সত্তা এক হয়ে গিয়েছিল।

আরো কতকগুলো মুহূর্ত ছিল। তার হাতগুলোর কি ক্ষমতা ছিল? তার বাহুদুটির মধ্যে যখন তার প্রেমিক চলে আসত, তখন তার প্রেমিক যেন এক অসহায় শিশু হয়ে পড়ত আর তার হাতদুটি মুক্ত সাবলীলতায় তাকে গ্রহণ করত, মনের মানুষকে কাছে টেনে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে ভরিয়ে তুলত আর তার অন্তঃসলিলা প্রেমধারায় সিক্ত করত তার প্রেমিককে। প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে সে তার প্রেমিকের জীবনবীণায় মৃদু ঝঙ্কার তুলত, তার দুঃখ, যন্ত্রণা সব দূরে সরিয়ে দিত। তার প্রেমিক তার হাতদুটি নিজের হাতের মধ্যে রেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকত, যেন পাপড়ি সরিয়ে কুঁড়ি পৃথিবীকে প্রথম দেখছে। হাতদুটিতে চাপ দিতে দিতে তার প্রেমিক সে দুটিকে নিজের বুকে রেখে যেন দেখাতে চাইত যে ঐ হাতদুটিই তার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে। বুক থেকে সে ঐ হাতদুটিকে তুলত নিজের ঠোঁটে আর তাদের উপরে দিত একাধিক উষ্ণ আর মধুর চুম্বন। ঐ চুম্বনগুলির মধ্যে যেন সে কৃতজ্ঞতা ঢেলে দিত। চুম্বনগুলি ছিল যেন তার অন্তরের সম্পদ— বিশুদ্ধ, শুভ্র আর প্রেমের দীপ্তিতে ভাস্বর আর প্রেমিকের হৃদয়-কাননের এই অক্ষয় ফুলগুলোকে ধরে রাখার চেয়ে আরো বড় সুখ যেন অনুভব করতে পারত না ঐ মহিলাটি।

আর একটি মূল্যবান মুহূর্ত এসেছিল। তার প্রেমিক অসুস্থ হয়ে পড়াতে তার হাতদুটিই তার প্রেমিককে অসুস্থতা থেকে স্বস্তি দিয়েছিল। সেই অসুস্থতার দিনগুলোতে তার ঐ হাতদুটিই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। প্রতি

মুহূর্তেই মহিলাটি তার প্রেমিকের কপালে হাতদুটি রাখত আর সেই হাত-দুটিকে খুঁজত তার প্রেমিকের হাত। হাতদুটিকে নিজের হাতের মধ্যে নিলে তার প্রেমিকের ভালো ঘুম হত আর থাকত তার ঠোঁটের কোণে শান্তির হাসি। প্রেমিকের হাতদুটিকে নিজের হাতের মধ্যে রাখবার সময়ে মহিলাটি অনুভব করত তার প্রেমিকের কামনা আর তার মনে হত যে তার নিজের জীবন থেকে একটি নদী যেন তার ঐ হাতদুটি বেয়ে তার প্রেমিকের দিকে বয়ে যাচ্ছে তাকে পবিত্র করতে। তার হাতগুলো তখন আর শুধু তার নিজের থাকত না, তার প্রেমিকেরও থাকত।

এ-সব কখন আরম্ভ হল? উত্তরের জন্যে সে নিজের হাতদুটির দিকে তাকাল। মনে হল যেন তার হাতদুটি তার সঙ্গে কথা বলেছে। মনে পড়ল সেই মুহূর্তটার কথা—যখন সে তার প্রেমিকের ডান হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে নিয়েছিল করমর্দনের জন্যে। সেই ছিল তাদের প্রথম পরশ। সেই থেকেই এ-সব কিছু আরম্ভ হল। কখনো কখনো অজ্ঞাত-সারেই তার প্রেমিকের হাত তার হাতের স্পর্শ পেতে চেয়েছে আর তার হাত যেন সেই স্পর্শের ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে। প্রায়ই তাদের লাজুক ভাব ফুটে উঠত আর এই লজ্জার মধ্যেই তারা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করেছে আর প্রত্যেক পরশেই অনুভব করেছে এক স্বর্গীয় সুখ। সামান্য স্পর্শের এই সুখ আবার পেতে তারা উষ্ণ আবেগে পরস্পর পরস্পরের হাত টিপত। এইভাবে তার আর তার প্রেমিকের হাতগুলো পরস্পরের প্রেমে পড়ল। শুধু পরস্পর পরস্পরকে ধরবার জন্যে হাতগুলো কেমন ভালোবেসে ফেলল একে অন্যকে। তার হাতদুটি তার প্রেমিকের মধ্যে এনেছিল এক শিশুসুলভ সরলতা। যখন মহিলাটি তার প্রেমিকের মুখের মধ্যে খাবার তুলে দিত, সেও শিশুর মতন হাঁ করত আর মহিলাটিও তার নিজের সন্তানের মতো তাকে খাওয়াত—তখনই সে তার প্রেমিকের মধ্যেকার নির্দোষ সারল্য প্রত্যক্ষ করত। বাস্তবিকই একটি শিশুর মতন তার হাতদুটি তাকে আদর করত। আর এখন সে একটা শিশুকে সামান্য সোহাগও করতে পারে না আর যদিও করে, তার অন্তরে যেন ঘা লাগে।

আবার তার দৃষ্টি পড়ল ঐ পাহাড়গুলোর উপরে। কিন্তু এখন ঐ পাহাড়গুলোকে দীর্ঘতর মনে হল। তারা যেন দু হাত বাড়িয়ে আছে আর এমনভাবেই বাড়িয়ে আছে যেন তারা স্থিতিস্থাপক কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি। কিন্তু আকাশ তবুও এদের থেকে অনেক অনেক দূরে। পাহাড়-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মধ্যে আবেগ সঞ্চার হল।

অনেক দূরে সে যেন ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু পতনের শব্দ পেল—তার প্রেমিকের অশ্রু। কেমনভাবে সে জানল? সে জেনেছিল। তার চেতনা তার প্রেমিকের অশ্রু পতনের শব্দ জানত। সে টেবিল থেকে হাতদুটি তুলে দাঁড়াল। তারপরে প্রসারিত করল হাতদুটি। দুটি সোজা সমান্তরাল রাস্তার মতন এগিয়ে এসে সে হাতদুটি তার চোখের জল মুছে দিল।

The Pair of Hands]   অনুবাদ : বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়

আংকেল বেন-এর মনোনয়ন

চিনুয়া অ্যাকেবে

১৯১৯ সালে আমি ছিলাম উম্বুর একজন তরুণ কেরানী। তখনকার দিনে একজন কেরানী হওয়া আজকালকার দিনে একজন মন্ত্রী হওয়ার সমান। আমার মাইনে ছিল দু পাউণ্ড দশ শিলিং। তোমরা হয়তো আমার মাইনে শুনে হাসছ—কিন্তু তখনকার দু পাউণ্ড আজকের পঞ্চাশ পাউণ্ডের সমান। মাত্র চার শিলিং-এ তখন তুমি একটা বড় ছাগল কিনতে পারতে। আমার মনে পড়ে ঐ কোম্পানির সব থেকে পুরনো আফ্রিকান ছিলেন একজন সেরো, যার মাইনে ছিল তেইশ পাউণ্ড চার শিলিং। আমাদের চোখে তিনি ছিলেন গভর্ণর জেনারেল।

অন্যান্য প্রগতিশীল যুবকদের মতো আমিও আফ্রিকান ক্লাবে যোগ দিয়েছিলাম। আমরা টেনিস, বিলিয়ার্ড খেলতাম। প্রত্যেক বছর আমরা ইয়োরোপিয়ান ক্লাবের সঙ্গে টুর্ণামেন্ট খেলতাম। কিন্তু ঐসব ব্যাপারে আমার আগ্রহ ছিল খুব কম। আমি সব থেকে বেশি পছন্দ করতাম—শনিবার রাতের নাচ। সেখানে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা ছিল বেশি। তাই বলে, আজকাল শহরাঞ্চলে যেরকম নেকা-নেকা মেয়েদের দেখা যায় সেরকম নয়; তারা সবাই দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল।

আমার একটা আনকোরা নতুন র‍্যালে বাই-সাইকেল ছিল। সকলে আমাকে 'জলি-বেন' বলে ডাকত, ভালোবাসতও খুব। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলার আছে—আমি যতই হাসি, তামাশা করি, মদ খাই বা অন্য কিছু করি না কেন, কোনো কিছুতেই আমি বেসামাল হয়ে পড়িনা। আমার বাবা বলতেন—আমাদের দেশের একজন প্রকৃত নাগরিক হতে হলে তাকে জানতে হবে কী ভাবে একচোখ খোলা রেখে ঘুমোতে হয়।

আমি কখনো সে কথা ভুলি নি। সেই জন্যে আমি সকলের সঙ্গে খেলতাম, হাসি ঠাট্টা করতাম এবং তারাও 'জলি-বেন, জলি-বেন' বলে চিৎকার করত, কিন্তু আমি জানতাম আমি কি করছি। উম্বুর মেয়েরা ছিল বড় চতুর—তুমি এক গোনার আগেই তারা দুই গুনতে শুরু করে। সেইজন্যে আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হত। আমি কোনোদিন তাদের আমার বাড়ির রাস্তা দেখাই নি; এমন কি, তাদের রান্না করা খাবারও খাই নি। আমি দেখেছি সেই সময় অনেক ছেলে এইভাবে মেয়েদের পাল্লায় পড়ে সর্বনাশের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই আমি আমার বাবার উপদেশ সব সময় মনে রাখতাম—'করমর্দনের পরিচয় করমর্দনেই শেষ করবে—হাত ধরাধরি পর্যন্ত এগোবে না।' তবে কেবলমাত্র একজন ছিল ব্যতিক্রম—এক দীর্ঘাঙ্গিনী, পীতবর্ণা মেয়ে, তার নাম মার্গারেট। সেদিনটা ছিল রবিবার। সকালে আমি আমার আনকোরা নতুন এইচ-এম-ভি গ্রামোফোনখানা বাজাচ্ছি (কোনোদিন হাত-ফেরতা জিনিসের উপরে আমার কোনো আস্থা নেই। নতুন কেনার মতো পয়সা আমার হাতে না থাকলে আমি বরং অপেক্ষা করি—এটাই আমার জীবনের নীতি)। আমি গ্রামোফোনে রেকর্ড চড়িয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে চুইংস্টিক চিবাচ্ছিলাম। রাস্তা দিয়ে মানুষেরা খুব সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় পরে কাছাকাছি একটা গির্জায় যাচ্ছিল। এই মার্গারেটও তাদের সঙ্গে ছিল। তখনই সে আমাকে দেখতে পায়। ভাগ্য খারাপ থাকলে যা হয়—আমি নিজেকে লুকানোর সময়টুকুও পর্যন্ত পাই নি। সেই-জন্যে মার্গারেট ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে গির্জা থেকে ফেরার পথে সোজা আমার ঘরে চলে এল। অবশ্য তার মতে তার আসার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে রোমান ক্যাথলিকে ধর্মান্তরিত করা। কিমাশ্চর্য! মার্গারেট, সুন্দরী মার্গারেট! কিন্তু মার্গারেট সম্বন্ধে আমি তোমাদের এখনই কিছু বলতে চাই না। এই পাগলামির ভূতটাকে কী ভাবে আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে-ছিলাম, সেই কথাটাই আমি তোমাদের বলতে চাই।

এবারের মতো সে-দিনটাও ছিল নববর্ষের একটি প্রাক-সন্ধ্যা। তোমরা নিশ্চয় জান মাসের শেষে মাইনে পাওয়া লোকেদের কাছে নববর্ষের আনন্দ বড়দিনের আনন্দকেও ছাপিয়ে যায়। কারণ, নববর্ষে প্রত্যেকের পকেট ভর্তি থাকে। তাই আমি সেদিন ভর্তি পকেটে ক্লাবে গেলাম।

আজকালকার ছেলেরা যখন বলেন—'আপনি একটু মদ্যপান করুন' তখন আমার হাসি পায়। তোমরা জান না মদ্যপান কাকে বলে। তোমরা এক বোতল বিয়ার বা এক পাঁইট হুইস্কি খেয়ে পাগলের মতো মাতলামি কর। সেদিন রাতে আমি 'হোয়াইট হর্স' চালিয়েছিলাম।

কী অদ্ভুত জিনিস এই 'হোয়াইট হর্স' ! এক পাত্তর গলায় ঢেলে যেখানে খুশি যাওয়া যায় ।

আমার একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে । আমি কখনো একজাতের মদ অন্য কোনো জাতের মদের সঙ্গে মিশিয়ে খাই না । যেদিন আমি হুইস্কি খেতে চাই সেদিন আমার হুইস্কি-ডে, তার পরের দিন যদি বিয়ার খাই তাহলে সেদিনটা হবে বিয়ার-ডে । আমি আর অন্য কোনো মদ ছুঁই না । সেদিন রাতে আমি হোয়াইট হর্স খাচ্ছিলাম, সঙ্গে ছিল চিকেন রোস্ট আর এক টিন গিনি গোল্ড সিগারেট । হ্যাঁ, আমি তখন ধূমপান করতাম । যেদিন একজন জার্মান ডাক্তার আমায় বললেন আমার হৃদপিণ্ড একেবারে রান্নার হাঁড়ির মতো কালো হয়ে গেছে সেদিন থেকে আমি ধূমপান একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম । ঐ জার্মান ডাক্তাররা ছিল দেবতা, তুমি তোমার যে জায়গাটা ব্যথা করছে দেখিয়ে দাও—ওরা এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ঠিক সেই জায়গায় ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়ে দেবে ।

কি যেন বলছিলাম—হ্যাঁ আমি এক বোতল হোয়াইট হর্স আর একটা চিকেন রোস্ট খেয়েছিলাম । তোমরা ভাবছ আমি বোধহয় মাতাল হয়েছিলাম । কিন্তু না, ঐ শব্দটাই আমার অভিধানে নেই । আমি জীবনে কখনো মাতাল হই নি । আমার বাবা বলেছিলেন, মাতাল হওয়া থেকে বাঁচার রাস্তা একটাই—সেটা হল ইচ্ছেমতো মদ খাওয়া বন্ধ করা । যখন আমার মদ খেতে ইচ্ছে করে আমি মদ খাই । আবার যখন বন্ধ করতে চাই তখন বন্ধ করি । সেদিন তাই প্রায় রাত তিনটে নাগাদ আমি মনে-মনে বললাম, যথেষ্ট হয়েছে । এই বলে আমার র‍্যালে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরে এলাম ।

সেই সময় আমাদের অফিসের বড়বাবু ক্যালিকোর গাঁট চুরির অপরাধে ধরা পড়ে জেলে ছিলেন । তাই আমি তখন ঐ পদে কাজ করছিলাম বলে আমি কোম্পানির একটা ছোট বাড়িতে থাকতাম । তোমরা নিশ্চয় জান জি-বি অলিভ্যান্ট এখন কোথায়—হ্যাঁ, সেই নিগার নদীর তীরে । আমার বাড়ি ছিল ঠিক সেইখানে । বাড়িটার একদিকের দুটো কামরা ছিল আমার দখলে, অন্যদিকের দুটো কামরা ছিল স্টোর কিপারের দখলে । কিন্তু আমার ভাগ্য এমনই যে—ঐ সময় ঐ স্টোর কিপার ছুটিতে ছিল—তাই ওর কামরা দুটো ছিল খালি ।

আমি সামনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম । তারপর আবার দরজা লাগিয়ে দিলাম । সামনের কামরায় সাইকেলটা রেখে শোওয়ার ঘরে ঢুকলাম । আমি তখন এমনই ক্লান্ত যে আলো জ্বালার কোনোরকম চেষ্টাই

করলাম না। জামা কাপড় খুলে চেয়ারের পিছনে রেখে নিজের ক্লান্ত শরীরটাকে বিরাট লোহার খাটে একটা গাছের গুঁড়ির মতো নিক্ষেপ করলাম। হায়, ঈশ্বর—আমার খাটে একজন মহিলা! সঙ্গে সঙ্গে আমার মন বলল এ নিশ্চয়ই মার্গারেট। তাই আমি হাসতে শুরু করলাম এবং তার দেহের এখানে ওখানে হাত দিতে লাগলাম। সে ছিল পুরোপুরি উলঙ্গ। আমি হাসতে হাসতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি কখন এলে?'

মেয়েটা চুপ করে রইল। আমার সন্দেহ হল ও বুঝি আমার উপর রাগ করেছে, কারণ ও আমাকে ক্লাবে নিয়ে যেতে বলেছিল, কিন্তু আমি ওকে নিয়ে যাই নি, আমি ওকে বলেছিলাম তুমি যদি নিজে থেকে ওখানে যাও তো আমার সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু আমি কাউকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবে যাই না। তাই আমার মনে হল ঐ জন্যে বুঝি ও রাগ করেছে।

আমি ওকে রাগ করতে বারণ করা সত্ত্বেও সে কোনো কথা বলল না। আমি জানতে চাইলাম সে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা। সে তবুও নিরুত্তর রইল। যদিও আমি বলেছি আমার বাড়িতে মেয়েদের আসা একদম পছন্দ করি না, তবুও প্রত্যেক নিয়মেরই তো একটু-আধটু ব্যতিক্রম আছে। সুতরাং আমি যদি বলি সেদিন রাতে মার্গারেটকে বাড়িতে দেখে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম, তাহলে একেবারে নির্জলা মিথ্যা কথা বলা হবে। আমি তখনো হাসছিলাম আর তার ষোড়শী মেয়েদের মতো পীনোন্নত বক্ষ দেখে মনে হয়েছিল তার চিৎ হয়ে শোওয়ার ভঙ্গিটির জন্যেই বুঝি এ রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন তার কেশ স্পর্শ করে বুঝলাম তার চুলগুলো ইয়োরোপীয় মেয়েদের মতো নরম। তখন আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। আমি তার মাথার চুলের উপরে হাত দিলাম। না; এও তো সেই রকমই। এই ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম 'তুমি কে?' আমার মাথা তখন পিপের মতো ফুলে উঠেছে; আমি তখন কাঁপছি। মেয়েটি তখন উঠে বসে হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকতে লাগল। এই সময় তার আঙুল আমাকে ছুঁয়ে গেল। আমি লাফ দিয়ে পিছিয়ে এসে চিৎকার করে তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। তারপর মনে মনে ভাবলাম একটা মেয়ের কাছে এত ভয় পাওয়ার কি আছে! সে একটা সাদা মেয়েই হোক বা কালো মেয়েই হোক। সবই তো ঐ দশ পেনির ব্যাপার। আমি বললাম—'ঠিক আছে, আমি এক্ষুণি তোমার মুখ দেখছি।' আমি টেবিলের উপর দেশলাই বাক্স খুঁজতে লাগলাম। সে আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে উঠল।

আমি বললাম—'তাহলে তুমি শ্বেতাঙ্গিনী নও—তুমি কে? তুমি কে

যদি না বল আমি তবে দেশলাই জ্বালাব।' আমি দেশলাই বাক্সটা নাড়িয়ে তাকে আমার উদ্দেশ্যটা বুঝলাম। আমি তখন আমার সাহস ফিরে পেয়েছি এবং মনে করতে চেষ্টা করছি এই কণ্ঠস্বর কার হতে পারে। কারণ, এই কণ্ঠস্বর আমার খুবই পরিচিত মনে হল।

তারপর আমি যা শুনলাম তা হল—'বিছানায় ফিরে এসো, তারপর আমি তোমায় সব বলব', তার কণ্ঠস্বর চিনির মতো মিষ্টি—কিন্তু সঠিক মনে করতে পারলাম না সেটা কার স্বর। তাই আমি দেশলাই কাঠি জ্বালালাম। তার শেষ কথা—'আমায় মাপ কর।'

তারপর আমি কি করেছিলাম বা কী ভাবে বেরিয়ে এসেছিলাম তা সহজেই অনুমেয়। আমি পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে ম্যাথিউ-এর বাড়ি গিয়ে দু হাত দিয়ে দরজায় আঘাত করেছিলাম।

সে বাড়ির ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কে ?'

'দরজা খোল, ঈশ্বরের দোহাই দরজা খোল'—আমি চিৎকার করে বলেছিলাম। আমি নিজের নাম বললাম কিন্তু এ যেন আমার কণ্ঠস্বর নয়। দরজাটা একটু ফাঁক হল ; দেখলাম আমার জ্ঞাতি ডান হাতে আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

সে বলল : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ঈশ্বর সেদিন আমাকে ম্যাথিউ ওবির বাড়ি নিয়ে এসেছিল ; কারণ সে-রাতে কোথায় যাচ্ছিলাম তা আমি জানতাম না। সেই সময় আমার জ্ঞান ছিল না—আমি এই পৃথিবীতে আছি না মরে গেছি। ম্যাথিউ আমার মুখে চোখে ঠাণ্ডা জল দিল। তারপর আমি—যা যা ঘটেছিল সব তাকে বললাম। আমার মনে হয় আমি তাকে উলটো-পালটা বলেছিলাম। কারণ, তা না হলে সে নিশ্চয় আমায় জিজ্ঞেস করত না যে, কী রকম দেখতে মেয়েটা ?

আমি বললাম—'আমি তাকে দেখি নি ?'

'ঠিক আছে—কিন্তু তুমি তো তার স্বর শুনেছিলে।'

'আমি তার স্বর শুনেছি ঠিক কথা এবং আমি তাকে স্পর্শও করেছি।'

ম্যাথিউ বলল—'আমি জানি না, তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে তুমি ভাল কাজ করেছ কি খারাপ কাজ করেছ।'

এটার কী ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত তা আমি জানি না। তবে ম্যাথিউর কথায় আমার দৃষ্টি খুলে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম নিগার নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মামি ওয়াতা আমার বাড়িতে এসেছিল।

ম্যাথিউ আরো বলল—'তুমি জীবনে কি চাও তার উপর এটা নির্ভর করে।

তুমি যদি ঐশ্বর্য সম্পদ চাও তাহলে তুমি আজ মারাত্মক ভুল করেছ। কিন্তু তুমি যদি বাপকা বেটা হও তবে আমার সঙ্গে হাত মিলাও।'

আমরা পরস্পর করমর্দন করলাম। ম্যাথিউ বলল—স্ত্রী সন্তান-সন্ততির চেয়ে কারও সম্পদকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এ কথা আমাদের বাবারা কোনোদিন বলেন নি। আজকাল আমার বউরা যখন আমাকে বিরক্ত করে তখন আমি তাদের বলি—আমি তোমাদের কোনো দোষ দিই না। আমি যদি বুদ্ধিমান হতাম তবে মামি ওয়াতাকে বিয়ে করতে পারতাম। তারা হাসে আর জিজ্ঞেস করে কেন আমি তাকে বিয়ে করি নি। সব থেকে ছোটটা আবার বলে—চিন্তা কোরো না সে আজ কিংবা কাল আবার আসবে। আবার তারা হাসতে শুরু করে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি এটা একটা তামাশা। কারণ সেই লোক কোথায় যে সন্তান-সন্ততির পরিবর্তে সম্পদকে পছন্দ করবে! একমাত্র একজন ব্যতিক্রম—শ্বেতাঙ্গ ডাঃ জে এম স্টুয়ার্ট ইয়ং। যে রাতে আমি মামি ওয়াতাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলাম সেই রাতেই সে ডাঃ জে এম স্টুয়ার্ট ইয়ং-এর বাড়িতে যায় তাঁর প্রেমিকা হয়ে। তোমরা নিশ্চয় শুনেছ সে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। কিন্তু মামি ওয়াতা তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেয় নি। তারপর সেই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক যখন মারা গেলেন তার সমস্ত সম্পদ বাইরের লোকদের হাতে চলে গেল। এখন আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি 'এটা কি সুসম্পদ?' ঈশ্বর না করুন এমন যেন কারুর হয়।

[Uncle Ben's Choice] অনুবাদ : মানস ঘোষ

কাগজের লিখন

ফিলিস অ্যাল্‌টম্যান

সূর্য উঠতেই বেরিয়ে পড়ল রানসোলি। ঈষৎ কালো চেহারার মানুষ। সূর্যের লাল আলোতে একটা মাকড়শা অথবা গুবরে পোকার মতো দেখাচ্ছিল তাকে। পেছন ফিরে দেখল, তার ছায়াটা লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কী অদ্ভুত চেহারা তার। অনেকক্ষণ ধরে সেই দিকে তাকিয়ে রইল সে; মনে হল, সেই ছায়া দেখে সে যেন অদ্ভুত একটা সাহস সংগ্রহ করছে। তারপরে ঘুরে সে হাঁটতে সুরু করল। রুজি-রোজগারের চেষ্টায় যৌবনে এইখানে আসার পর থেকে সে আর কখনো এই পথ দিয়ে হাঁটে নি।

বলিরেখায় তার চোখের পাতা দুটি ঝুলে পড়েছে। সেই দুটি ঝুলন্ত কোঠরের ভেতরে তার চোখ দুটি ঢুকে গিয়েছে। দেখার মতো শক্তি তাদের আর নেই। দেখলে মনে হবে বয়স তার ষাট বছরের বেশি। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নাসিকা, দাড়ি, আর জামার বিশেষ একটি ছাঁট তার একটা গাম্ভীর্য বাড়িয়ে তুলেছে। তার চুল আর দাড়ি সাদা। কালো রঙের স্যুট আর সাদা শার্টের সঙ্গে তার খালি দুটো পা মোটেই খাপ খায় নি। একটা লাল কাপড়ের পুঁটলি সে লাঠিতে বেঁধে কাঁধের উপরে ঝুলিয়েছে; জুতো আর কিছু সম্পত্তি হাতে নিয়ে সে হাঁটছে।

এই বৃদ্ধ মানুষটি সরল। নিজের চেষ্টাতেই ঘরে বসে সে সেলাই শিখেছিল। এই সেলাই করেই সে জীবিকা নির্বাহ করত। এখন সেই জীবনই তার ছিন্নমূল হয়ে গেল। রাজার আইন তাকে বাস্তুহারা করল—একটুকরো কাগজ; অর্থ বোঝা দূরের কথা, কাগজটাতে কি লেখা ছিল তাও সে পড়তে পারত না। শিশুর মতো বড় বড় অক্ষরে কোনো রকমে নিজের নামটা সে লিখতে পারত; তাই, যে-কোনো লেখাকে সে বড় ভয় করত।

যেখান থেকে সে এসেছিল সেইখানেই তাকে ফিরে যেতে হবে এই নির্দেশই সেই কাগজখানিতে লেখা ছিল।

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা যে কত তা সে বুঝতে পারত না। সেই বিরাট দেশে দুটি কামরাবিশিষ্ট একটি ঘরে নিজের দোকানে সে শান্তিতে বসবাস করত। আইন তাকে খুঁজে বার করল কী করে তা সে বুঝতে পারল না। একটি কর্মচঞ্চল জনাকীর্ণ অঞ্চলে আইন তাকে খুঁজে বার করেছে; কিন্তু সেই আইনের চোখ-দুটো এতই ঘৃণ্য যে তারা তাকে সেই স্থান থেকে উৎখাৎ করে ছাড়ল। তাকে ছাড়িয়ে নিলে তার স্ত্রীর কাছ থেকে, তার মৃতা কন্যার দুটি সন্তান সিপো আর থ্যাবোর কাছ থেকে। তারাই ছিল তার কাছে ঈশ্বরের উপহার, তারাই ছিল তার আনন্দ।

কাগজের উপরে লেখা কয়েকটা কালির আঁচড় যখন বিশ্বের চেহারাটাকে ভেঙে চুরমার করে দেয় তখন একটা মানুষ তার প্রতিকার করবে কী করে? 'পাশ' অফিসের একটি আফ্রিকাদেশীয় কেরানী ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার সময় কাগজটা সে ধরে রইল। তার হাত তখন কাঁপছিল।

একটা অদ্ভুত ধরনের ভ্রূকুটি করে রেগেই কেরানীটি বলল: 'তোমাকে যেতেই হবে। এখানে তুমি থাকতে পারবে না। যেখানে তুমি জন্মেছিলে সেখানে তোমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।'

একটু ইতস্তত করে অনেক আশা নিয়ে সে বলল: 'কিন্তু এখানে আমি যে বাস করব তার অনুমতিপত্র রয়েছে।'—এই বলে পত্রটা সে তার সামনে ধরার চেষ্টা করল।

কেরানী সেটি হাত দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল; তারপরে বলল—'কোনো অনুমতিপত্রই এখন তোমার কাজে লাগবে না। তুমি বাইরে থেকে এসেছ; বাইরেই তোমাকে চলে যেতে হবে।'

'কারণ?'

'কারণ এইটাই আইন—নতুন আইন।'

'এ আবার কী রকম আইন? এ আইন কি বাচ্চাকে তার মায়ের গর্ভে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারে? এটা কি একটা ওষুধ যা খেলে আমার মুখ ঝকঝকে তকতকে হয়ে যাবে, নতুন ভাবে জীবন সুরু করার জন্যে আমার পা দুটোকে শক্ত করতে পারবে? এইটাই আমার বাড়ি। আপনার দেশের একটি মেয়েকেই আমি বিয়ে করেছি।...'

কেরানীটি ভীষণ চটে উঠে বলল—'এ-সব আবোল-তাবোল বকে কোনো লাভ নেই। তুমি এসেছ পর্তুগীজ ইস্ট থেকে। সুতরাং, দক্ষিণ আফ্রিকায় তুমি বাস করতে পার না। তোমাকে যেতেই হবে।'

পর্তুগীজ ইস্ট—দক্ষিণ আফ্রিকা ! ভূগোলে রানসোলীর জ্ঞান খুবই কম ; ছিল না বললেই হয়। এখানে সে অনেক সূর্যোদয় দেখেছে। এখানে আসার তার যে কোনো অধিকার ছিল না সে কথা কেউ তাকে বলে দেয় নি। মাটির অন্ধকারে গর্ত খোঁড়ার জন্যে, চাষ করার জন্যে, পশুপালন করার জন্যে তারা তার শক্তিকে শোষণ করেছে। সে তার পিঠ সোজা করে চারপাশে যখন রুজি-রোজগারের চেষ্টায় চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দর্জির কাজে যখন সে তার আঙুলগুলিকে পাকিয়ে তুলছিল, বিয়ে করে যখন সে বাপ হয়েছিল তখন কোনো আইন তাকে বাধা দেয় নি।

তার স্ত্রী ফওলেনকে এ-কথা সে কেমন করে বোঝাবে ? মাথাটা নিচু করেই সব কথা সে তার স্ত্রীকে বলল ; কারণ, সে যে কী অন্যায় করছে তা সে জানত না।

তার বুকের উপরে নিজের দেহটা মিলিয়ে দিয়ে তার স্ত্রী ফিসফিস করে তাকে বলল—'তুমি যেয়ো না ; আমাকে একলা ফেলে রেখে যেয়ো না।'

দাম্পত্য জীবনে চিরকালই সে তার স্ত্রীকে আশ্রয় দিয়েছে, রক্ষা করে এসেছে সব সময়। সে কী করে তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করাবে যে একটুকরো কাগজের উপরে কয়েক ছত্র লেখা তার মনুষ্যত্ব কেড়ে নেবে, ক্লিব হতে বাধ্য করবে তাকে ? যখন তার স্ত্রী বুঝতে পারল যে তার স্বামীকে কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না তখন সে নিজের মাথায় জামা ঢাকা দিয়ে মড়াকান্না কাঁদতে লাগল। সিগো আর থ্যাবোও তার স্কার্ট জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

নতুন আইনের চোখ কেবল রানসোলীকেই খুঁজে বার করে নি ; এখানে, ওখানে, সেখানে দু-একটা রাস্তা এদিক-ওদিকে অনেকেই এর শিকার হয়েছে। পুরুষগুলি উধাও হয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ তা জানে না। ঘরে কেবল তাদের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা দিন কাটাতে লাগল না খেয়ে। তাদের প্রতিবেশী মাজুঙ্গা—খুব দাম্ভিক মানুষ ছিল। ভয়-ডর বলতে কিছু সে জানত না। সেও এই সব কাগজ-লিখিয়েদের চটিয়েছিল ; অমান্য করেছিল আইন। তার ফলটা কী হল ? পুলিশের গাড়িতে করে কুকুরের মতো তাকে তারা ধরে নিয়ে গেল। তার স্ত্রী তখন প্রসব বেদনায় ঘরের মধ্যে কাতরাচ্ছে।

এই সব দেখে সে ভেবেছিল তাকে যেতেই হবে। তবু সে একবার মাজুঙ্গার শ্যালক মোকেলের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে গেল। মোকেলে হো-হো করে হেসে উঠল। মনে হল, সেই কেরানীটির মতো সেই হাসিটিও রাগেরই প্রকাশ। তবে সেই রাগটা তার উপরে নয়।

সে বলল—যেতে তোমাকে হবেই ; কারণ, ওরা তোমাকে ভয় করে। ওদের শিক্ষা, বড়-বড় বাড়ি, ওদের দেবতা আর কামান বন্দুক এত—তবু তারা তোমার মতো অশিক্ষিত একজন দর্জিকে ভয় করে। তাদের ভয় এতই বেশি যে তোমার মতো বুড়ো লোক দেখেও তারা থরথর করে কাঁপে। তাদের মুখে থু থু।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে নিজের দিকে রানসৌনী একবার তাকিয়ে দেখল।

মোকেলে আবার হাসল ; তারপরে কর্কশ স্বরে বলল—হ্যাঁ, বুড়ো কাকা ; তুমি যতই বুড়ো হও, পিঠ তোমার বয়সের ভারে যত নুয়ে পড়ুক না কেন, তোমাকে দেখেই তারা ঘাবড়িয়ে যায়।

দুঃখের মধ্যে এই কথাগুলিই তাকে সান্ত্বনা দিল। এই সান্ত্বনাকে সম্বল করে সে তার দোকানটা বিক্রি করে দিল। তার দোকানের কাপড়, পুরনো মেশিন, সুতার গুলি, বুরুশ আর চক—সব বিক্রি করে সামান্য এক মুঠো নোট পেল। তারপরে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। শক্ত করে রাখল মুখের চেহারা। তার চোখের জল গাল বেয়ে সহজেই ঝরে পড়ত ; কিন্তু সেই জলকে সে জোর করে ধরে রইল। অন্য লোকেরা তার প্রিয় জিনিসগুলিকে নির্মম হাতে তুলে নিয়ে গেল।

সব শেষ হয়ে গেল। চল্লিশ বছর ধরে যে কঠোর পরিশ্রম সে করেছিল তারই ফলশ্রুতি হল সামান্য কয়েকটা কাগজের নোট। একটা নিজের কাছে রেখে সবগুলি সে তার স্ত্রীকে দিয়ে দিল। তার স্ত্রী তার অর্ধেকগুলি নোট নিয়ে গেল মাজুঙ্গার স্ত্রীকে দিতে। মাজুঙ্গার স্ত্রী সবেমাত্র একটি সন্তান প্রসব করেছিল। স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে, সে সিপো আর থ্যাবোকে তার কাছে ডাকল। তাদের বাড়িতে যে বিষাদের একটি ছায়া নেমে এসেছে তার অর্থটা ঠিক বুঝতে না পারলেও তারাও কেমন মুষড়িয়ে পড়েছিল। তাই তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় চুপচাপ তার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু তাদের ঠাকুর্দা তখন হাসছিল। এই রকম হাসি সে আগেও হাসত। এই দেখে তারাও হাসল। তারা ভেবেছিল সব ঠিক রয়েছে ; কোনো অঘটন ঘটে নি। সে তাদের প্রত্যেককে ছ পেনী করে দিল। তারা আনন্দের সঙ্গে সেগুলি নিয়ে হাতমুঠো করে ফেলল।

রানসৌনী দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করল—তোরা আমাকে কী দিবি রে ?

তারা বলল—আমাদের তো কিছু নেই।

হাতটা একটু মুঠো করে সে নাতিদের বলল—তাহলে তোরা যা।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল তারা। হঠাৎ সিপোর কী যেন মনে হল। রাস্তার উপরে থমকে দাঁড়িয়ে সে একবার পিছু ফিরে তাকাল। শিশুটিকে অভিবাদন জানানোর জন্যে সে স্যালুট করার ভঙ্গিতে তার একটা হাত উপরে তুলল। ওই শিশুটাই তো এখন থেকে এ-বাড়ির পুরুষ।

ফাওলেন এসে দেখল সে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোল না। পরস্পরের দিকে কেবল তাকিয়ে রইল তারা। তাদের আর যে দেখা হবে না সেটা তারা দু জনেই জানত; কারণ অত বয়সে প্রায় অন্ধের সামিল হয়ে আবার সে তার স্ত্রী আর শিশুদের জন্যে নতুন করে জীবন সুরু করবে কি করে? তার স্ত্রীর মুখের শিরাগুলি শক্ত হয়ে উঠল। সে তার স্বামীর জামার কলারটা হাত দিয়ে সোজা করে দিল; স্ত্রী হিসাবে স্বামীর প্রতি এই তার শেষ কর্তব্য। তারপরে হাত দিয়ে সে তার স্বামীর গাল দুটি স্পর্শ করল। এক মুহূর্তের জন্যে রানসোলী তার স্ত্রীর হাতটা নিজের হাতে ধরেই ছেড়ে দিল। সে যখন তার পুঁটলিটা তুলে নেওয়ার জন্যে ঘাড় নিচু করল তখন তার স্ত্রী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রইল। মৃদু স্বরে স্ত্রীর নাম একবার ডেকেই সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার তখন চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে যাচ্ছিল। সেই কান্না বুকের মধ্যে চেপে তাড়াতাড়ি সে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে বাস করার জন্যে সে উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলতে লাগল। তাদের ভাষায় এখন আর সে কথা বলে না। হাঁটতে-হাঁটতে একটা প্রশ্নই বার বার তার ক্লান্ত মনটাকে বিব্রত করতে লাগল। মোকেলে যা বলেছে তা কি সত্যি? প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বেতাঙ্গরা তাকে এত ভয় করে যে, তারা তাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! তার এই দুর্বল শরীরটার মধ্যে ভয় করার মতো এমন কী রয়েছে? তার চোখ দুটিও তো প্রায় দৃষ্টিহীন হয়ে এসেছে! কিন্তু সেই কথাটাই তার মাথার ভেতরে নাচতে লাগল। কিছুতেই সরাতে পারল না তাকে।

দুপুরের দিকে পথশ্রান্ত হয়ে সে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসল। শেষ বারের মতো সে একবার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল। তার মনে হল দূরে আকাশ আর পৃথিবী ঝাপসা হয়ে উঠেছে। যে দেশ ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে সেই দেশের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ধকার।

[The Paper Writers] অনুবাদ : তুলতুল ভট্টাচার্য

আফ্রিকার বুকে একটি সকাল

ল্যাংস্টন হিউজ

মাউরাই তার রঙচটা নীলরঙের ফুলতোলা ক্যালিকো চোগাটা খুলে ফেলল। বাড়ির পিছনের উঠানে দু-বালতি জল আর সাবানের একটা বড় তাল নিয়ে গিয়ে সর্বাঙ্গে জল ঢেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল। তারপর তার ছোট্ট সোনালি রঙের শরীরটা ইংলিশ তোয়ালে দিয়ে মুছে বাড়ির ভিতরে ফিরে গেল। তার মা তাকে বলে দিয়েছিল, যখনই সে তার বাবার সঙ্গে বেরুবে, কিম্বা যখনই তাকে এক্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে কোনো কাজে পাঠানো হবে, অথবা নাইজার নদী বেয়ে তাদের ছোট শহরে যে-সব বড় বড় স্টিমারগুলি আসে তাদের কোনটায় যেতে হবে, তখন সে যেন সাহেবী পোশাক পরে। এই কারণে, তার মা মারা যাওয়ার আগে তাকে যে সাদা শার্ট ও সাদা রঙের সেলার ট্রাউজার কিনে দিয়েছিল, সেগুলিই সে এখন পরে ফেলল।

বেশি দিন হয় নি তার মা মারা গেছে। তার মা ছিল কালো, খাঁটি আফ্রিকান। কিন্তু তার বাবা হচ্ছে সাদা, তাই মাউরাই হয়েছে বর্ণসঙ্কর। তার বাবা চাকরি করেন ব্যাঙ্কে ; বস্তুতঃ তিনি হলেন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট এবং ঐ ব্যাঙ্কটিই ছিল ঐ শহরে ও আশেপাশের কয়েক মাইল বিস্তৃত এলাকার মধ্যে একমাত্র ব্যাঙ্ক। ঐ অঞ্চলে সাদা মানুষের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয় এবং বর্ণসঙ্কর বলতে একমাত্র মাউরাই-ই ছিল।

এই কারণেই মাউরাই-এর বিশেষ অসুবিধা হত। গ্রামের মধ্যে সেই ছিল আধা নেটিভ, আধা ইংরেজ ছেলে। তার কালো মা মারা যাওয়ার পর মায়ের দিকের আত্মীয়-স্বজনেরা কেউ মাউরাইকে চায় নি। তার বাবার দিকের আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউই আফ্রিকায় ছিল না ; তারা থাকত সুদূর ইংলণ্ডে, আর তারা সকলেই ছিল সাদা চেহারার। মাঝে মাঝে মাউরাই

বাইরে কোথাও গেলে খাঁটি আফ্রিকান ছেলেমেয়েরা তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়ত। তার দোষ, সে হচ্ছে দো-আঁশলা আর সে সাদা সাহেবদের সঙ্গে বাস করত ঘেরা চৌহদ্দীর মধ্যে, যেখানে স্বাধীনতার মৃদু গুঞ্জন কিম্বা সুদূর লাগোস থেকে আজিকিউয়ির কণ্ঠস্বর তখনো অনুপ্রবেশ করে নি। মাউরাই-এর মা যখন বেঁচেছিল তখন সে ছেলের হয়ে লড়াই করেছে, কিন্তু এখন তার নিজেকেই লড়তে হয় নিজের পক্ষ নিয়ে।

ফিকে তাজা সকালের আলোয় মাউরাই সাহেবদের জন্যে সংরক্ষিত বড় চারকোণা এলাকাটা অতিক্রম করে যে কোণে ব্যাঙ্কটি অবস্থিত ছিল সেদিকে পা বাড়াল। ব্যাঙ্কের একটা প্রবেশপথ ছিল সংরক্ষিত এলাকার ভিতরে, অন্যটা ছিল নেটিভদের চলাফেরা করার জনবহুল রাস্তার দিকে। মাউরাই আশ্চর্য হয়ে চিন্তা করল, সাদা মানুষরা কালো মানুষদের ছোঁয়া এড়াবার জন্যে নিজেদের চারদিকে কী সুন্দর বেড়া তৈরি করেছে—কালো মানুষরা সব যেন জন্তু জানোয়ার। সাধারণতঃ কেবলমাত্র চাকরবাকররা ও স্ত্রীলোকেরা ঐ বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকতে পারত। তার বাবা তো এর মধ্যেই একজন যুবতী কালো মেয়েকে তাদের বাড়িতে এনে রেখেছে। মেয়েটা একেবারে বাচ্চা আর বেশ লাজুক, তার মায়ের মতো জ্ঞানবুদ্ধি হয় নি এখনো মেয়েটির।

সেদিন ছিল স্টিমার-ডে অর্থাৎ জাহাজ ছাড়ার দিন, তাই লেনদেনের জন্যে সকালেই ব্যাঙ্কে বেশ কিছু লোকের সমাবেশ হয়েছিল। মাউরাইও ব্যাঙ্কে গিয়েছিল তার বাবার একটা চিঠি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে। তার বাবার অফিস কামরায় তিন-চার জন অ্যাসিস্ট্যান্ট তখন প্রেসিডেন্টের ডেস্কটি ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। দরজাটা ঠেলে খুলতেই মাউরাই-এর কানে গেল স্বর্ণমুদ্রার ঠুনঠুনানি আওয়াজ। স্বর্ণ মুদ্রার একটা বিরাট স্তূপ ডেস্কের উপরে রাখাছিল, লোকরা সেগুলি শুনছিল। মাউরাই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে সেই শব্দে তারা চট্ করে আগন্তুককে দেখে নিল।

'বাইরে অপেক্ষা কর, মাউরাই' মুদ্রাগুলির উপরে হাত চাপা দিয়ে তার বাবা চড়া গলায় বলে উঠলেন। ছোট ছেলেটি তাই শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাঙ্কের কর্মব্যস্ত মেইন রুমে ফিরে গেল। তারা চায় নি যে মাউরাই মুদ্রার স্তূপটা দেখে ফেলে।

মাউরাই জানে, ইংরেজরা পছন্দ করে না যে তার গ্রামের আফ্রিকানরা সোনাদানার মালিক হয়, কিন্তু সাদা মানুষদের কাছে ওগুলি ছিল বিশেষ মূল্যবান। ওরা ঐ নিয়েই সব সময়ে আলোচনা করে, ওগুলি গুনতে ব্যস্ত থাকে ও পরে জাহাজে করে দেশে পাঠিয়ে দেয়।

মাউরাই আরো জানে, একজন কালো ছেলে একখণ্ড সোনার মুদ্রা চুরি

করলে তাকে বহু বছর জেল খাটতে হয়। হঠাৎ তার নিজের ছোট হাত-দুটির দিকে তাকিয়ে তাই সে ভাবে, 'আমার গায়ের রঙটা সোনার রঙের মতো বলেই বোধ হয় কালো মানুষরা আমায় ঘৃণার চোখে দেখে।'

তখনই তার বাবা অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, 'এই যে মাউরাই, "ড্রুরি" জাহাজের ক্যাপ্টেন হিগিন্সকে এই চিঠিটা দিয়ে বলবে যে আমি বিকেল চারটেয় তার সঙ্গে চা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করব।'

'হ্যাঁ, স্যার', নেটিভদের রাস্তার দিকে বেরিয়ে নদীর দিকে যেতে যেতে উত্তর দিল মাউরাই। বড় জাহাজটার মাস্তুলগুলি দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল।

জাহাজের ডেকের উপরে সকলেই তখন ব্যস্ত। স্ত্রীলোকেরা বিক্রি করছে হরেক রকম খাবার জিনিস আর ছেলের দল অপেক্ষায় রয়েছে নাবিকদের তীরে আসার। হুইলগুলি ঝনঝনিয়ে উঠল, আর ক্রেনগুলির সাহায্যে পাম তেল ও কোকোবিনের পেটিগুলি উপর দিকে উঠতে সুরু করল। বড় জাহাজটার অন্ধকার গহ্বরে দোলায়মান দড়ির ঝুড়িগুলি বোঝাই করছে একদল আবলুস কাঠের মতো কালো রঙের মানুষ, যাদের ঘামে-ভেজা শরীরের উপরাংশ ছিল অনাবৃত। তাদের চক্চকে শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে কোকোবিনের বস্তাগুলির উপরে আর সেইভাবে ইংলণ্ডে গিয়ে ফিরে আসছে সোনা হয়ে, যে সোনা সাদা মানুষরা গুনে গুনে ব্যাঙ্কে জমা করছে, যেন জগতে ওর চেয়ে দামী জিনিস আর কিছু নেই।

জাহাজের পাশের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে, ডেকের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা নাবিকদের পাশ কাটিয়ে মাউরাই ব্রিজে উঠে ক্যাপ্টেনের অফিসে পৌঁছে গেল। কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন সোনালি রঙের ছোট ছেলেটার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নিল।

জাহাজের ব্রিজ থেকে নেমে আসার সময়ে সোজসুজি তার চোখে পড়ল জাহাজের বিরাট অন্ধকারে গহ্বরগুলি, যেখানে আরো কতগুলি কালোমানুষ ঘর্মাক্ত শরীরে পাম তেল ও কোকোবিনের পেটিগুলি ভাঁড়ারজাত করে রাখছিল ইংলণ্ডে রপ্তানির জন্যে।

একজন সাদা নাবিক ডেকের উপরেই মাউরাইকে ধরে বলল, 'আমায় নিয়ে চল একটা সুন্দরী মেয়ের কাছে।' জাহাজ লাগার দিনে স্থানীয় দেহপসারিণীরা কয়েকটা ছেলেকে নিয়মিতভাবে ডেকে পাঠিয়ে দিত খদ্দের ধরার কাজে। এই ছেলেগুলি দু-চারটে অশ্লীল ইংরেজি কথা আওড়াতে পারত আর খদ্দের ধরতে পারলে তাদের পৌঁছে দিত নির্দিষ্ট বাড়ির দরজা পর্যন্ত। কালো মেয়েগুলিকে নাবিকদের পছন্দ হলে তারা খুশি হয়ে ছেলেদের দিকে

এক-আধটা পেনি ছুঁড়ে দিত। সাদা নাবিকটা ভেবেছিল মাউরাই হয়তো ঐ ছেলের দলের একজন।

'আমি ওদের দালাল নই', বলেই নাবিকটার হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ডকে নেমে এল মাউরাই। খেজুরপাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘরগুলির বাসিন্দা কালো মেয়েগুলির দালাল একদল কালো ছেলে তাকে দেখে হাসতে আর ঠাট্টা করতে শুরু করল, কারণ সে হল না সাদা না কালো। পরে তারা তাকে অসভ্য ভাষায় গালাগালি করাতে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের একজনের মুখে একটা ঘুসি মারল।

লড়াইয়ে এই ছেলের দলের সততার কোনো বালাই ছিল না। তাই তাদের মধ্যে জনা-বারো একসঙ্গে মাউরাইকে ঘুসি ও লাথি মারতে আরম্ভ করল; এমন-কি যে কালো স্ত্রীলোকেরা জেটিতে বসে ফলমূল আর মিঠাই বিক্রি করছিল তারাও ছেলেদের সঙ্গে এই আক্রমণে যোগ দিল। অন্যদিকে, স্টিমারের রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা নাবিকরাও এই উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য দেখে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করছিল।

কালো ছেলেদের দলটা বিশ্রী হাসির সঙ্গে ধিক্কার দিতে দিতে মাউরাইকে জেটি থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল চওড়া বড় রাস্তায়। সেখানে পৌঁছে সে নাক থেকে গড়িয়ে-পড়া রক্তের ধারাটা মুছে ফেলে তার সাদা শার্টটার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। জেটির ছুঁচোগুলোর ঘুসির দাপটে তার শার্টটা ছিঁড়ে গেছে। মাউরাই সবিস্ময়ে ভাবল, সাহেবী পোশাক গায়ে থাকা সত্ত্বেও ঐ নাবিকটা কী করে তাকে বেশ্যাদের দালাল ঠাউরিয়ে একটা সুন্দরী মেয়ে জুটিয়ে দিতে বলল।

সেই ছোট্ট মিউল্যাটো ছেলেটা বড় রাস্তা ধরে মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাঙ্কের বাড়িটা পার হল, যেখানে তার বাবা কাজ করে। তারপর অতিক্রম করল সেই লোকটার বাড়ি, যে নাবিকদের কাছে টিয়াপাখী আর বাঁদর বিক্রি করে। সে আরো এগিয়ে গেল ব্যায়ামো গাছটির দিকে, যেখানে বসে লোকেরা তালের রস বিক্রি করে। এইভাবে শহর ও জঙ্গলের সীমারেখা পার হয়ে একটা সরু পথ ধরে সে এসে পৌঁছাল এক বদ্ধ জলাশয়ের কাছে, যেখানে দ্রাক্ষালতারা পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই জলাশয়ের ধারে সবুজ ঘাসের উপরে চন্দ্রালোকিত নিশীথে ওবিয়া নর্তকীরা মাতাল হয়ে নাচে।

মাউরাই সেখানে তার জামাকাপড় খুলে ফেলে জলে নামল এবং সেই জলে তার কালশিরা-পড়া ছোট্ট শরীরটাকে ঠাণ্ডা করল। সে সাঁতারে পটু ছিল এবং সাপ বা কুমীরের ভয় তার ছিল না। সে ভয় করত শুধু সাদামানুষদের

ও কালো মানুষদের আর সোনারবরণ মুদ্রাগুলিকে। জলে বিচরণ করতে করতে সে ভেবে আশ্চর্য বোধ করল, তার দেহের রঙ সোনালি হল কেন? কেন সে তার মায়ের মতো কালো বা বাবার মতো সাদা না হয়ে সোনালি রঙের হল? জেটির ছুঁচোগুলোর বিশ্রী গালাগাল তখনো তার কানে বাজছিল।

একবুক বাতাস নিয়ে দম বন্ধ করে সে ক্রমশঃ জলের নিচে ডুবে যেতে থাকল যতক্ষণ না তার নগ্ন শরীর জলাশয়ের তলদেশের ঠাণ্ডা কাদা স্পর্শ করল।

সে ভাবল, 'যদি আমি চিরকাল এই জলাশয়ের অন্ধকার তলদেশে থেকে যেতে পারতাম।'

কিন্তু তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার শরীর একটা কর্কের মতো উপরে ভেসে উঠল এবং সেই বিরাট জলধারের মাঝখানে সূর্যের আলো তার সোনালি শরীরটা ছুঁয়ে গেল। সে জলাশয়ের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে সাঁতার কাটতে লাগল, কারণ সে ফিরে যেতে চায় না তার বেড়া-ঘেরা ঘরে। সে ভেবে নিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের বসবার ঘরে তার বাবা চা পানে আপ্যায়িত করবে সেই সাদা ক্যাপ্টেনকে আর মাউরাই ও তার বাবার অঙ্কশায়িনী ছোট কালো মেয়েটিকে রান্নাঘরে খাওয়া দাওয়া সারতে হবে।

কিন্তু ভীষণভাবে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ায় সে জল থেকে উঠে পড়ে জলাশয়ের ধারে সবুজ ঘাসের উপরে শুয়ে তার শরীরটা রোদে শুকিয়ে নিতে চেষ্টা করল। বারো বছরের ছোট ছেলেটি তখন আর স্থির থাকতে পারল না, সে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। সে তার মৃতা মায়ের কথা চিন্তা করল আর ভাবল তার বাবা চাকরি থেকে অবসর নিলে ইংলণ্ডে ফিরে যাবে, তাকে ফেলে রেখে যাবে এই আফ্রিকায় যেখানে সে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত।

জঙ্গলের মধ্যে থেকে একজোড়া পাখী উড়ে এসে তার মাথার উপরে একটা গাছের ডালে বসে গান গাইতে সুরু করল। তারা জানত না, তাদের ঠিক নিচে মাটিতে পড়ে একটা ছোট ছেলে কেঁদে চলেছে। জলাশয়ের ধারে পড়ে-থাকা সোনালি রঙের সেই ছোট্ট শরীরটা থেকে যে-সব অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছিল সে সব তাদের কানে গেল না। তারা কয়েক মুহূর্ত গান গাইল, পরে তাদের উজ্জ্বল ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

[African Morning] অনুবাদ : বিমল ঘোষ

পথের কাহিনী

ল্যাংস্টন হিউজ

সমানে তখন বরফ পড়ছিল। কিন্তু সে তা লক্ষ্যই করে নি। লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থাও তার ছিল না। সেই দুর্যোগের মধ্যে ট্রেন থেকে যখন সে নামল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সার্জেণ্ট তখনো দেখে নি যে বরফ পড়ছে। অনুভব করছে হয়তো তার ঘাড় থেকে বরফগুলো গলে গলে শরীর বেয়ে কেমন সিরসির করে নেমে যাচ্ছে। ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে, শীতে কাঁপছে। জুতোর মধ্যে থেকে বরফগলা জল পচপচ করে উপচে পড়ছে। তাকে জিগ্যেস করলে তবু সে বলতে পারবে না বরফ পড়ছে কি না। কারণ এ-সব দেখার মতো শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই তার ছিল না। বড় রাস্তার উজ্জ্বল আলোতেও তাই সে লক্ষ্য করে নি সাদা সাদা বরফের আঁশগুলো রাত্রির বুকে কেমন করে নিঃশব্দে ঝরে ঝরে পড়ছে। তার পেটে তখন খিদের অসহ্য জ্বালা, ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে। দুঃসহ ক্লান্তিতে সে পা দুটো টেনে টেনে কোনোমতে চলেছে।

বারান্দায় এসে বাতির সুইচ টিপতেই রেভারেণ্ড মিঃ ডরসেট পরিষ্কার দেখতে পেলেন বাইরে বরফ পড়ছে। এবং, বাড়ির দরজা খুলতেই দেখতে পেলেন কালো লম্বা মতো একটা মানুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখ-চোখ তার বরফে ঢাকা। কালো রাতের একটা টুকরো যেন মানুষের অবয়বে মুখে বরফ মেখে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোনো বেকার!

সার্জেণ্ট কিছু বলবে ভাবছিল। তার আগেই রেভারেণ্ড মিঃ ডরসেট বললেন, 'তোমার এই অবস্থার জন্যে আমি ভীষণ দুঃখিত। কিন্তু এখানে তো জায়গা হবে না। তুমি ঐ দিকে সোজা চলে যাও। চার নম্বর ব্লক পেরিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরে যাবে। সাত নম্বর ব্লকে পৌঁছুলে একটা

ত্রাণ শিবির দেখতে পাবে। সত্যি, আমি ভয়ানক দুঃখিত। কিন্তু না, এখানে তোমার জায়গা হবে না।'

দরজাটা তিনি সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

স্বর্গের সেই পবিত্র মানুষটাকে সার্জেণ্ট বলতে চেয়েছিল যে সেখানে যাওয়ার আগে সে ঐ ত্রাণ শিবিরে গিয়েছিল। এবং, এই দুর্যোগের বছরে আরো শত শত ত্রাণ শিবিরে সে ঘুরেছে। কোথাও থাকার জায়গা সে পায় নি। সবাই বলেছে জায়গা নেই, রাতের খাবারও নেই। সব গুলোই এমন ভর্তি যে সাদা কালো মানুষরা সেখানে প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করেই রয়েছে। কিন্তু পাদ্রীসাহেব এ-সব কথা শুনতেই চান নি, তাই তিনি সোজা বলে দিলেন, 'না'। বলেই আবার দরজাটা বেশ শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দেবার মতো একটা দরজা অবশ্য তাঁর আছে। সার্জেণ্ট চলে যাচ্ছে সেখান থেকে। বরফ মাথায় করে সে এগিয়ে চলেছে। সে দিকে তার হুঁশ নেই। এতক্ষণে হয়তো সে কিছুটা টের পেয়েছে। গোটা শরীর ভিজে গিয়েছে, প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে, সেঁটে-যাওয়া চোয়ালখানা কালো কালো ভিজে দুটো হাতে চেপে ধরে আছে। পায়ের জুতো জোড়া ভিজে জবজব করছে। সার্জেণ্ট একবার দাঁড়াল। রাস্তার ধারে গিয়ে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখল। তার তখন যত খিদে, তত ঘুম, তত শীত। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তবু সে আর একবার ভালো করে দেখল। একবার ডান দিকে তাকাল। দেখল সামনেই একটা চার্চ। নিশ্চয়ই চার্চ, কারণ পাদ্রীসাহেবের বাড়ির ঠিক পাশেই ওটা রয়েছে। চার্চ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। ওতে দুটো দরজা রয়েছে। রাত্রির বরফে ঢাকা সাদা চওড়া সিঁড়ি, বেশ উঁচু দুটো খিলানের দরজা। দরজার দু-পাশে সরু-লম্বা পাথরের দুটো থাম। ওপাশে রয়েছে শৌখিন কাজ করা গোল মতো একটা জানালা। তার মাঝখানে রয়েছে পাথরের একটা ক্রুশ এবং ঐ ক্রুশে ঝুলে আছে একটা পাথরের যীশু মূর্তি। রাস্তার স্বল্প আলোয় বিবর্ণ দেখাচ্ছে সব কিছু। বরফের মধ্যে মনে হচ্ছে ওগুলো আরো কঠিন, অনুভূতি-হীন, পাথরের মতো বিশ্রী ফ্যাকাসে। সার্জেণ্ট ভালো করে আবার দেখল। উপরের দিকে চোখ তুলতেই তার চোখের মধ্যে বরফ ঢুকে গেল। সেই রাতে এতক্ষণে সে দেখতে পেল যে বরফ পড়ছে। মাথাটা জোরে ঝাঁকি দিয়ে কোটের আস্তিন থেকে বরফগুলো ঝেড়ে ফেলল। খিদের কথাটাও আবার তখন তার মনে পড়ে গেল। মনে হল সে বুঝি এবার টলে পড়ে যাবে। না, সে পড়ে গেল না। বরং বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়াল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে চার্চের সিঁড়ি বেয়ে

উঠে গেল। দরজায় ধাক্কা দিল। কোনো সাড়া নেই। দরজার হাতল ঘুরাতে গিয়ে বুঝল তালা বন্ধ। এবার একটা দরজায় সে কাঁধ লাগাল। কালো লম্বা শরীরখানা শক্ত লোহার শিকের মতো ঢালু হয়ে বেঁকে গেল। প্রচণ্ড জোরে একটা ঠেলা দিল। শেকলবাঁধা কয়েদীরা যেমন তালে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করে গান গায়, দম বন্ধ করে মুখে সেই রকমের শব্দ করে আবার একটা ধাক্কা দিল প্রাণপণে। এক একবার মরীয়া হয়ে দরজাটা ঠেলে আর থেমে থেমে বলতে থাকে, 'আমি ভীষণ ক্লান্ত···খিদেয় পেট পুড়ে যাচ্ছে···ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে···শীতে কাঁপছি···শোবার জায়গা একটা পেতেই হবে···এটা চার্চ···এখানে একটা জায়গা চাই-ই।'

দরজাটায় সে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে চলল।

হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের একটা শব্দ হল। দরজাটা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যাচ্ছে, প্রচণ্ড জোরে টলতে টলতে সার্জেণ্ট আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছে এবং তখনো সে টলছে।

দু-তিনজন সাদা সাহেব যেতে যেতে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। ব্যাপার দেখে হৈহৈ করে উঠল, 'আরে অ্যাই, দরজাটা ভেঙ্গে যাবে যে।'

সার্জেণ্ট কিছুই শুনতে পেল না। আরো তিন-চারজন চিৎকার করতে করতে সেখানে এসে জুটল। একসঙ্গে সবাই হাউ-মাউ করে বলল, 'অ্যাই, অ্যাই, কী হচ্ছে এখানে?'

শ্বাস বন্ধ করে আবার একটা ধাক্কা দিয়ে সার্জেণ্ট বলল, 'আমি জানি এটা সাদা সাহেবদের চার্চ। কিন্তু আমাকে শুতে হবে এখানে।' বলেই আবার সে ধাক্কা দিল।

আর তখনি মড়মড় করে দরজাটা ভেঙ্গে পড়ল।

ততক্ষণে একটা গাড়ি হুড়মুড় করে এসে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দু জন সাদা পুলিশ মোটা মোটা লাঠি হাতে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। জাপটে ধরল সার্জেণ্টকে। অনেক টানাটানি করেও কিছু হল না। সার্জেণ্ট তখন আঁকড়ে ধরে আছে। না, ভাঙ্গা দরজাটা না। সে ধরে আছে দরজার পাশে লম্বা সরু পাথরের একটা থাম। কিছুতেই নড়বে না সে। পুলিশরা যত টানে সেও তত জোরে সেঁটে যায় থামটার গায়ে।

রাস্তার লোকগুলো এসে সাহায্য করল পুলিশদের। ওরা বলতে লাগল, 'কালো পাহাড়ের মতো বেকার নিগ্রোটা আমাদের চর্চে এসে নড়তে চায় না। ব্যাটা ভেবেছে কী?'

শেষ পর্যন্ত না পেরে পুলিশ সার্জেণ্টের মাথায় পিটতে লাগল লাঠি দিয়ে। কেউ একটা আপত্তিও করল না। সার্জেণ্টের শেষ অবলম্বন ঐ

থামটা। ধরে আছে বেশ শক্ত করে। আর সবাই তাকে ধরে টানছে। শেষে থামটা টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল।

গোটা চার্চটা খসে খসে পড়তে লাগল।

চার্চের সামনে দিকের পাথরের বড় চাঙড়টা আগে পড়ল। তারপর দেয়াল, ছাদের বর্গা, জানালা, ক্রুশ, ক্রুশের উপর ঝোলানো পাথরের যীশুমূর্তি—সব একে একে খসে পড়ল। শেষে আস্ত চার্চটাই ভেঙ্গে পড়ল। ইট, পাথর, সুরকীর তলায় পুলিশ এবং অন্যরা সবাই চাপা পড়ে গেল। বরফের মধ্যেই চার্চখানা হুমড়ি খেয়ে পড়ে রইল সেখানে।

সার্জেন্টও চাপা পড়েছিল। সেখান থেকে বের হয়ে আবার সে চলতে শুরু করল। ওই থামটার একটা টুকরো কাঁধে নিয়েই সে চলেছে। সার্জেন্ট ভাবল, রেভারেণ্ড মিঃ ডরসেটের বাড়িখানাও চার্চের তলায় চাপা পড়েছে। তার মনে পড়ে গেল কেমন করে পাদ্রীসাহেব তাকে দরজার বাইরে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মুখের উপর বলেছিলেন না! এখানে হবে না। ভাবতে ভাবতে সার্জেন্ট একবার হাসল। ছ নম্বর ব্লকের কাছে পৌঁছে কাঁধের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে হাঁটছে। বরফের উপর ভিজে জুতোর শব্দ হচ্ছে পচ, পচ, পচ। ভেবেছিল সে একাই চলেছে। কিন্তু নিজের পায়ের শব্দ ছাড়াও তার মনে হল কে যেন বেশ ভারি ভারি পা ফেলে তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। এদিক-ওদিক তাকাতেই সে দেখতে পেল, তার পাশে পাশে যীশুও হেঁটে আসছেন। জানালার ক্রুশের উপরে যে মূর্তিটা ঝুলেছিল এ সেই যীশুমূর্তি! মূর্তিখানা তখনো পাথর হয়ে আছে এবং পাথরের ক্ষতচিহ্ন ছড়িয়ে আছে তার সর্বাঙ্গে। চার্চটা যখন ভেঙ্গে যায় এবং জানালার ক্রুশ থেকে যে মূর্তিটা তখন খসে পড়ে, সেই মূর্তিখানাই চলেছে এখন সার্জেন্টের পাশে পাশে।

সার্জেন্ট বলল, 'নাছোড় হয়ে এখন তো আমার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আসছ! জীবনে এই প্রথম দেখলাম যে ক্রুশ থেকে তুমি নেমে এসেছ।'

বরফের উপর হাঁটতে হাঁটতে যীশু বললেন, 'ঠিক বলেছ। ঐ ক্রুশ থেকে আমাকে নামাতে গিয়ে আস্ত চার্চটাই তোমাকে ভেঙ্গে ফেলতে হল।'

'তুমি খুশি হয়েছ তো?' জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'ও নিশ্চয়ই।'

ওরা দু জনেই হেসে উঠল।

সার্জেন্ট বলল, 'নরকেরও অধম আমি, তাই না? চার্চখানা ভেঙ্গে ফেললাম!'

যীশু বললেন, 'খুব ভালো কাজ করেছ। প্রায় দু হাজার বছর ধরে ওরা আমাকে একটা ক্রুশে ঝুলিয়ে রেখেছিল।'

'জানি, নিষ্কৃতি পেয়ে বেশ আনন্দ হয়েছে তোমার।'

যীশু বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

তখনো বরফ পড়ছে। তার মধ্যে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে দু জনে।

সার্জেন্ট একবার পাথর মূর্তিটার দিকে তাকাল।

আশ্চর্য হয়ে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল, 'দু হাজার বছর ধরে ওখানে তুমি ঝুলেছিলে ?'

যীশু বললেন, 'আমি তো তাই জানি।'

দুঃখিত হয়ে সার্জেন্ট বলল, 'সামান্য কিছু টাকা যদি আমার থাকত তবে তোমাকে আমি কিছুটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারতাম।'

যীশু উত্তর দিলেন, 'আমি সবই দেখেছি।'

'দেখেছ, কিন্তু সে তো অনেক বছর আগে।'

'একই কথা। সব কিছুই আমি দেখেছি।'

বরফের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে তারা রেল স্টেশনের কাছে এসে গিয়েছে। সার্জেন্ট তখন এত ক্লান্ত যে সে ঘামছে আর টলছে।

রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে তুমি ?'

যীশুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে আরো বলল, 'আমি তো পথের মানুষ। তুমি এখন কি করবে ? কোথায় যাবে তুমি ?'

যীশু বললেন, 'ঈশ্বর জানেন, তবে এখানে আর থাকছি না।'

বরফের পর্দায় ঢাকা রেল লাইনের লাল সবুজ বাতিগুলো তারা দেখতে পাচ্ছে। দূরে লাইনের ধারে জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো তখনো জ্বলছে। ভবঘুরে শ্রমিকরা থাকে ওখানে।

সার্জেন্ট বলল, 'ওখানে গিয়ে শুতে পারি আমি।'

অবাক হয়ে যীশু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে শোবার জায়গা পাবে ?'

সার্জেন্ট বলল, 'অবশ্যই পাবো, কারণ ওখানে দরজা নেই একটাও।'

শহরের বাইরে, রেল লাইনের পাশে ঐ বাঁধটার নিচে আছে নিষ্ফলা কিছু গাছ, আর ঝোপ জঙ্গল। অন্ধকারে বরফের আড়ালে আবছা দেখা যাচ্ছে সেগুলো। ঐ ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আছে কতকগুলো কুঁড়ে-ঘর। ঘরগুলো সহজেই এখানে-ওখানে বয়ে নেওয়া যায়। কারণ বাক্স, টিন, পুরনো কাঠের টুকরো আর ত্রিপল দিয়ে তৈরি ঐ সব ঘর। যদিও অন্ধকারে সবকিছু এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবু তুমি যদি কখনো এই পথ দিয়ে হেঁটে যাও, এই দুর্যোগের বছরে আশ্রয়হীন, ক্ষুধার্ত ঐ মানুষগুলোর

সঙ্গে যদি কখনো থেকে থাক, তা হলে তুমি নিশ্চয়ই জান যে ঐ কুঁড়ে-ঘরগুলো ঠিক ওখানেই রয়েছে।

সার্জেণ্ট বলল, 'ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমি ওখানে চললাম।' যীশু বললেন, 'আমি যাচ্ছি কানসাস শহরে।'

বিদায় জানিয়ে সার্জেণ্ট বলল, 'তাই যাও, আবার দেখা হবে।'

শ্রমিকদের জঙ্গলে গিয়ে শোবার মতো একটা জায়গা পেয়ে গেল সে। যীশুর সঙ্গে তার আর দেখা হল না। সকাল ছটার সময় একটা ট্রেন জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সার্জেণ্ট তার জঙ্গলের আশ্রয় থেকে হামাগুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। আরো দশ-বারো জন তার সঙ্গে সঙ্গে এল। ছুটে গেল সার্জেণ্ট। ছুটতে ছুটতে সে গাড়ির একটা বগি ধরে ফেলল। তখন সকাল। বেশ সকাল হয়ে এসেছে। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। চারিদিকে ধোঁয়াটে হয়ে আছে। সার্জেণ্ট ভাবল, 'আশ্চর্য! এই শীতের রাতে যীশু কেমন করে কোথায় চলে গেলেন? নিশ্চয়ই এই রাস্তা ধরেই তিনি গিয়েছেন কারণ শোবার জন্যে এই জঙ্গলে তিনি তো আসেন নি।'

ট্রেনের বগিখানা ধরে তখনো ছুটছে সার্জেণ্ট। ওটা ছিল কয়লার বগি। সে তার ছাদের উপর উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য, বগিটা যে পুলিশে ভর্তি! কাছের পুলিশটা লাঠি দিয়ে জোরে মারল সার্জেণ্টের আঙুলের গাঁটে, তার হাতে। বেশ শব্দ হল। সার্জেণ্টের হাত কিন্তু একটুও আলগা হল না। তখনো সে বগির ছাদে উঠবার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে সার্জেণ্ট শুধু বলল, 'জাহান্নামে যাও, আগে উঠতে দাও আমাকে।'

ঘেউ-ঘেউ করে উঠল পুলিশটা, 'চুপ কর, তুই একটা পাগল নিগ্রো জানোয়ার।'

আবার সে সার্জেণ্টের আঙুলে মারল। পেটে ভীষণ জোরে লাঠির একটা গুঁতো মেরে বলল, 'এখনো কি তুই জঙ্গলে আছিস ভেবেছিস? এটা তোর ট্রেন নয়, জেলখানা।'

জেল-কামরার গরাদ ধরে সার্জেণ্ট তখনো দাঁড়িয়ে। পুলিশটা তার হাতে পায়ে ক্রমাগত মেরেই চলেছে।

আশ্চর্য! সার্জেণ্টের কোনো হুঁশ নেই সেদিকে। পরে হঠাৎ তার মনে হল, সত্যি তো সে জেলের মধ্যে রয়েছে! ট্রেনের কোনো বগির ছাদের উপরে তো নেই! গত রাতের রক্তগুলো তার মুখে চাপ বেঁধে শুকিয়ে আছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দু হাতে গরাদ ধরে অস্থির হয়ে যত সে

চিৎকার করছে, লোহার দরজাটা তত ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করে কেঁপে উঠছে। পুলিশটা সমানে পিটে চলেছে তার আঙুলের গাঁটগুলোতে। থে'তলে ফেটে ফুলে উঠছে সেগুলো। এতক্ষণে সার্জেন্টের মনে পড়ল, গত রাতে চার্চের দরজা ভাঙ্গার অপরাধে এরা তাকে জেলে পুরেছে।

গরাদ ছেড়ে তখন ঠাণ্ডা পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে সে বসল। সার্জেন্টের কী যেন হল! নিঃসীম শূন্যতার অতল গভীরে ধীরে ধীরে সে হারিয়ে যেতে লাগল! এমন তো কখনো হয় নি তার! তার পোশাক সব ভিজে। ভিজে চটচটে হয়ে গিয়েছে সব। জুতোর মধ্যে জল জবজব করছে। আস্তে আস্তে সকাল হয়ে আসছে তখন। জেলের ছোট্ট একটা কামরার মধ্যে তাকে আটক করা হয়েছে। দরজার বাইরে বন্ধ তালাটা ঝুলে আছে। কাঠের বেঞ্চিতে বসে তার ফুলো ফুলো রক্তমাখা আঙুলগুলোয় সে হাত বুলাচ্ছে।

ঐ বন্ধ দরজাটা সার্জেন্টের নয়, পুলিশের ঐ লাঠিটাও তার নয়, ফেটে ফুলে যাওয়া অকেজো আঙুলগুলোই শুধু তার! দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে সার্জেন্ট বিড়বিড় করছে, 'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। এই দরজাটা উপড়ে ফেলে দেব আমি।' কথাটা শুনতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল পুলিশ, 'চুপ কর জানোয়ার, নইলে বেঁধে ফেলে রাখব এবার।'

গর্জে উঠল সার্জেন্ট। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দরজাটা আমি ভাঙবো-ই।'

এরপর সার্জেন্ট নিজের সঙ্গেই যেন কথা বলতে লাগল, 'এই সময় যীশু কোথায় যে গেলেন! সত্যি, কানসাসেই কি চলে গেলেন তিনি?'

[On the Road] অনুবাদ : রতিরঞ্জন নাথ

যে ছেলেটি কৃষ্ণকায় খ্রিস্ট এঁকেছিল

জন হেনরিক ক্লার্ক

কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের মাস্কোগি কাউন্টি স্কুলে সেই ছেলেটিই ছিল সবচেয়ে চটপটে। যাঁরা এই বিদ্যালয়টির সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরাও প্রত্যেকে এ কথা জানতেন। শিক্ষিকাও তাকে যেমন আদর্শ ছাত্র বলে দেখিয়ে দিতেন তেমনই গর্বের সঙ্গেই সর্বদা তার নাম উচ্চারণ করতেন। আমি একবার তাঁকে বলতে শুনেছিলাম, 'ও যদি শ্বেতাঙ্গ হত তা হলে ও হয়তো কোনোদিন প্রেসিডেণ্ট হতেও পারত।' একমাত্র দোষ আরন ক্রফোর্ড শ্বেতাঙ্গ ছিল না—বরং তার গায়ের চামড়া ছিল এত কালো যে তা চকচক করত এবং তার মধ্যে প্রতিফলিত হত তার অন্তরের গুণ, যা ছিল আমার বোধের অতীত।

অনেকদিক থেকে তার চেহারা আমার মনে হত অদ্ভুত, জোড়াতালি দেওয়া ধরনের। তার মুখের পক্ষে তার নাক ও ঠোঁট মনে হত বেশ কিছুটা বড়। সে কুৎসিত ছিল বলাটাও যেমন অন্যায় হবে, তেমনই খুব সুন্দর ছিল বলাটাও অত্যুক্তি হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ওর সম্বন্ধে আমি আমার মনস্থির করে উঠতেই পারি নি। কখনো মনে হত ও যেন প্রাচীন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসেছে…যন্ত্রযুগ এসে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলার আগে যে চমৎকার যুগ ছিল ওকে মনে হত সেই যুগের প্রতিভূ।

তার প্রতিভার বৈচিত্র্য অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চমৎকৃত করত। এর ফলে তার সহপাঠীরা তার দিকে তাকাত বিস্ময় ও বিদ্বেষের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে।

থ্যাঙ্কস গিভিং-এর আগে ও সর্বদাই ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকত মোরগ ও কুমড়োর ছবি। জর্জ ওয়াশিংটনের জন্মদিনে ও আঁকত ছোট ছোট কুড়াল

দিয়ে ঘেরা বড় বড় আমেরিকান পতাকা। এইসব ছোট ছোট শিল্প-নৈপুণ্যের জন্যেই সে কলাম্বাসের জর্জিয়াতে সবচেয়ে বেশি আলোচিত কৃষ্ণাঙ্গ বালক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাস্কোগি কাউন্টি স্কুলের নিগ্রো প্রিন্সিপাল বলতেন যে ও এক সময় হেনরী ও' ট্যানারের মতো বড় শিল্পী হবে।

বড়দিনের ছুটি আরম্ভের প্রায় এক সপ্তাহ আগে শিক্ষিকার জন্মদিন উপলক্ষে আরন ক্রফোর্ড এমন একটা ছবি এঁকেছিল যার ফলে একটা হৈচৈ যেমন পড়েছিল তেমনি মাস্কোগি কাউন্টি স্কুলেও এসেছিল একটা পরিবর্তন। সেদিন সকালে যে মুহূর্তে সে ঘরে ঢুকেছিল সেই মুহূর্তে সকলের দৃষ্টি পড়েছিল তার উপরে। তার ছেঁড়া বই-এর থলির পাশে সে বয়ে এনেছিল পুরনো খবরের কাগজে জড়ানো বড় ফ্রেমে বাঁধানো একটা কিছু। সে যখন তার বসার জায়গায় গিয়েছিল তখন আধা হাসি-জড়ানো মুখে অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের ভাব নিয়ে শিক্ষিকার চোখদুটি তার প্রতিটি গতি অনুসরণ করছিল।

আরন তার বই নামিয়ে রেখে মুখভরা হাসি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল শিক্ষিকার ডেস্কের দিকে। তার সজাগ চোখদুটি ছিল আনন্দে এত উজ্জ্বল যে তা প্রায় ভীতি সঞ্চারক হয়ে উঠেছিল। ছেলেমেয়েরা নিজেদের বসার জায়গায় ঝুঁকে পড়ে তার দিকে লোভীর মতো তাকিয়েছিল; প্রত্যেকের অস্থির বুকে ছিল নতুন কিছু আবির্ভাবের সম্ভাবনা।

শিক্ষিকা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছিলেন যে আরন তাঁর জন্যে কিছু একটা উপহার এনেছে। তখনো হাসতে হাসতে আরন জিনিসটা ডেস্কে রেখে সেটার আবরণ খোলায় শিক্ষিকাকে সাহায্য করছিল। শেষ আবরণের টুকরো খুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা চোখে অবিশ্বাসের দ্যুতি নিয়ে হঠাৎ জিনিসটা থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন। সেই কঠিন উদ্বেগের মধ্যে তাঁর গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট ও ভীতিজনক হয়ে উঠেছিল। সাময়িকভাবে ঘরটাতে আর কোনো শব্দ ছিল না।

আরন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকানোয় সেই উপহারটা যেন খারাপ কোনো জীবন্ত জিনিস এমনই ভাবে তিনি সাবধানে তাঁর হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন উপহারটির কাছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি সেরূপ কোনো উপহার আদৌ প্রত্যাশা করেন নি।

অনিচ্ছাকৃত দ্রুতভঙ্গিতে আমি ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘরের সর্বত্র প্রত্যেকের কণ্ঠে চাপা গুঞ্জন উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল। শিক্ষিকা চোখে ভর্ৎসনার দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকিয়েছিলেন ছেলেমেয়েদের দিকে। আরন তাঁর জন্যে যে উপহার এনেছিল সেটির উপর থেকে কারোরই দৃষ্টি নড়ছিল না। ···সেটা ছিল কালো রঙে আঁকা খ্রিস্টের একটি ছবি।

গতিতে বিস্ময়ানুভূতি ছড়িয়ে আরন ফিরে গিয়েছিল তার জায়গায়।

শিক্ষিকা আমাদের মুখোমুখী হলেন। তাঁর মুখের দ্বিধাজড়িত হাসি এখন মৃদু বিস্ময়ে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাঁর সামনের উজ্জ্বল মুখগুলিতে কি যেন খুঁজতে লাগলেন এবং তাঁর সামনের ডেস্কে রাখা ছবিটির দিকে তাকানো যেন নিষিদ্ধ আনন্দ পাওয়া এমনি ভাবে মাঝে মাঝে সেদিকে চোরা চোখে তাকিয়ে আবার হাসতে শুরু করলেন।

অবশেষে কণ্ঠে অনিশ্চয়তার একটা সামান্য সুর টেনে তিনি বললেন, 'আরন, এ উপহারটি খুবই আনন্দদায়ক। ধন্যবাদ, আমি এটি সযত্নে রাখব।' তিনি থামলেন এবং তারপর আগের তুলনায় একটু বেশি সংলগ্নভাবে কথা বলে চললেন; 'মনে হয় তুমি বড় শিল্পী হতে চলেছ···তুমি একবার এগিয়ে এস না! তুমি কী ভাবে এই চমৎকার ছবিটি আঁকলে এসে সে কথা তোমার ক্লাসের বন্ধুদের শোনাও।'

যখন সে কথা বলার জন্যে দাঁড়াল, গোটা ঘরে নেমে এল নিস্তব্ধতা এবং ছেলেমেয়েরা তার বক্তব্য শোনার জন্যে সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করল। সাধারণত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বক্তব্য শোনার জন্যেও তারা এত মনোযোগ দিত না। সে প্রথমে কিছু বলে নি; সে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বড় কনসার্ট শিল্পীর মতো নিজের হাতদুটি নিয়ে খেলা করছিল এবং সযত্নে লক্ষ্য করছিল তার শ্রোতাদের।

প্রতিটি কথার উপর পূর্ণ জোর দিয়ে সে বলল: 'এই আঁকাটা হয়েছিল এইভাবে। আমার কাকা নিউইয়র্কে থাকেন এবং ওয়াই. এম. সি. এ-তে নিগ্রো ইতিহাসের ক্লাস নেন। তিনি গতবার যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন তখন তিনি ইতিহাস তৈরি করেছেন এমন অনেক বড় কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের কাহিনী শুনিয়েছিলেন আমাকে। তিনি বলেছিলেন যে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিরাই একসময় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল। আমি যখন তাঁকে খিৃস্টের সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তিনি বলেছিলেন যে খিৃস্ট কৃষ্ণকায় না শ্বেতাঙ্গ ছিলেন তা কেউ কখনো প্রমাণ করে নি। যাই হোক আমার মনে কেমন একটা অনুভূতি এসেছিল যে খিৃস্ট কৃষ্ণকায় মানুষ ছিলেন; তিনি এত দয়ালু ও ক্ষমতাশীল ছিলেন, আমি যে-সব শ্বেতাঙ্গকে জানি তাদের চেয়ে বেশি দয়ালু ছিলেন তিনি। কাজেই আমি যখন তাঁর ছবি এঁকেছিলাম তখন আমি যেমন ভেবেছিলাম তেমনি ভাবে তাঁকে না এঁকে পারি নি।'

এরপর সেই ক্ষুদে শিল্পীটি গালভরা হাসি নিয়ে বসে পড়েছিল, যেন যে জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের অধিকার সে পেয়েছিল তা পাবার বা বোঝার সাধ্য সাধারণ মানুষের ছিল না।

এই অবস্থায় শিক্ষিকা আর কি করবেন ভেবে না পেয়ে ছেলেমেয়েদের সীট ছেড়ে এগিয়ে এসে আরনের বিশিষ্ট শিল্পকর্মটি দেখতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আমি যখন ছবিটার কাছাকাছি এসেছিলাম তখন আমি দেখেছিলাম যে পাঁচ ও দশ সেণ্টের দোকানে যে রকম রঙ পাওয়া যায় তা দিয়ে ছবিটি আঁকা। ছবিটি ছিল সামান্য ঝাপসা, যেন রঙটা শুকোবার আগেই কেউ ফ্রেমটা নাড়াচাড়া করেছিল। খ্রিস্টের চোখদুটি ছিল গভীর ও বিষণ্ণ, অনেকটা আরনের বাবার চোখের মতো; তিনি ছিলেন স্থানীয় ব্যাপটিস্ট গীর্জার ডীকন। আমি যখন সান্‌ডে স্কুলে ছিলাম তখন সেখানে খ্রিস্টের যে ছবি দেওয়ালে টাঙানো দেখেছিলাম এ ছবিটা ছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ ছবিটা দেখে মনে হচ্ছিল যে কোনো অসহায় নিগ্রো যেন নীরবে দয়া ভিক্ষা করছেন।

পরের সপ্তাহে স্কুল টার্ম শেষ হল এবং সে বৎসর ছাত্রছাত্রীদের শ্রেষ্ঠ হাতের কাজের সঙ্গে আরনের ছবিও অ্যাসেম্ব্লি রুমে প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে আরনের ছবিই প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে সম্মানের স্থান পেয়েছিল।

যে দিন ছুটি হয়ে যাবে সেদিন লেখাপড়ার কাজ ছিল না এবং ছেলে-মেয়েরা ছিল আনন্দে মশগুল। মেয়েদের উজ্জ্বল রঙিন পোশাক বসন্তের আগমন বার্তার আভাস নিয়ে এসেছিল।

দুপুরবেলা সব ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছিল ছোট অ্যাসেম্ব্লি রুমে। এইদিনে আমাদের মধ্যে সর্বদাই দেখা দিতেন এমন-একজন লোক যাঁর কথা শিক্ষক-শিক্ষিকারা শ্রদ্ধা ও ভীতিমিশ্রিত স্বরে বলতেন। তাঁরা তাঁকে বলতেন অধ্যাপক ড্যানুয়াল এবং তাঁরা সবসময়ই তাঁর নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করতেন। তিনি ছিলেন ছোট ছোট স্কুল ও কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেমেয়েদের জন্যে আলাদা করে রাখা নিম্নমানের স্কুলগুলিসহ শহরের সব স্কুলের পরিদর্শক।

আমাদের আনন্দোল্লাসের প্রায় শেষে সেদিন এই মহামানবটি এসে হাজির হয়েছিলেন। তাঁকে হলঘরে ঢুকতে দেখে ছেলেমেয়েরা দাঁড়িয়ে মিষ্টিভাবে মাথা নত করে আবার নিজের নিজের জায়গায় বসে পড়েছিল— তবে তিনি যেন সার্কাসের কেউ এমনইভাবে তাদের চোখগুলি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখছিল।

তিনি ছিলেন লম্বা, একজন শ্বেতাঙ্গ এবং তাঁর মাথা ভর্তি সাদা চুলের দরুণ তাঁর শীর্ণ মুখটি বস্তুত যত বিবর্ণ নয় তদপেক্ষা অধিক বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

তাঁর চোখদুটির মতো পরিষ্কার নীল চোখ আমি আর দেখি নি। তাঁর দেহে চোখদুটিই ছিল মাত্র জীবন্ত।

তিনি যখন রুমে ঢুকে সামনের দিকে এগোচ্ছিলেন তখন নিগ্রো প্রিন্সিপাল জর্জ দুভল যাচ্ছিলেন তাঁর আগে আগে যাতে তাঁর অগ্রগমনের পথে কোনো বাধা না পড়ে। তিনি যখন আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন তখন আমি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভীত শ্বাস নেবার শব্দ শুনে অবস্থার জটিলতা অনুভব করলাম।

মঞ্চের মধ্যস্থলে একটা বড় চেয়ার রাখা ছিল। সেটি সুন্দরভাবে পালিশ করা হয়েছিল এবং সহায়ক সযত্নে তার কুশনটাও মেরামত করেছিল। এই পরিদর্শকটি, কেউ তাঁকে পথ দেখিয়ে সেখানে না নিয়ে গেলেও সেটা যে তাঁরই জন্যে রাখা সেটা ধরে নিয়ে সোজা সেই চেয়ারের কাছে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো প্রিন্সিপাল এই বিশিষ্ট অতিথির পরিচিতি দিলেন আমাদের কাছে এবং তিনিও আমাদের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে অনুগৃহীত করলেন। বক্তৃতাটি অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমার মনে পড়ে বক্তৃতার প্রায় শেষ দিকে তিনি বলেছিলেন যে আমাদের মধ্যে কেউ যদি পরজীবনে বুকার টি. ওয়াশিংটনের মতো বড় কৃষ্ণাঙ্গ লোক হয়ে ওঠে তাহলে তিনি বিস্মিত হবেন না।

তিনি বসার পর স্কুলের কোরাস দুটি আধ্যাত্মিক সঙ্গীত গাইল এবং চতুর্থ শ্রেণীর মেয়েরা ইণ্ডিয়ান লোকনৃত্য প্রদর্শন করল। এখানেই আনন্দ কর্মসূচীর অবসান হল।

এরপর পরিদর্শক মঞ্চ থেকে নেমে উৎসুক্য-রঙিন চোখে গির্জার সামনে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজের প্রদর্শনী দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মুখটা অদ্ভুতভাবে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তাঁর স্পষ্ট নীল চোখদুটি বিস্ময়ে চিকচিক করে উঠল। তিনি আরন ক্রফোর্ডের খ্রিস্ট চিত্রটি দেখছিলেন। তিনি যান্ত্রিকভাবে তাঁর নুয়ে পড়া শরীরটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ছবির কাছে এবং উৎসুক চোখে ও দোমনা ভঙ্গিতে ছবিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন; ওটা যেন এমন একটি বিপজ্জনক জন্তু সেটা যে-কোনো মুহূর্তে জেগে উঠে ধ্বংস ছড়িয়ে দিতে পারে।

আমরা তাঁর পরবর্তী কাজ কি হবে তা জানার জন্যে সোদ্বেগে অপেক্ষা করছিলাম। নীরবতায় দম বন্ধ হয়ে আসছিল। অবশেষে তিনি দেহ বাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সম্মুখের কঠিন মুখগুলির সন্ধান করতে

লাগলেন। নিগ্রো প্রিন্সিপালের উপরে সপ্রতিবাদে তাঁর দৃষ্টি পড়ার পর তাঁর চোখের অগ্নিদ্যুতি কিছুটা কমল।

তিনি তীক্ষ্ণভাবে জানতে চাইলেন; 'এই ধর্মবিশ্বাসবিরোধী বাজে ছবিটা কে এঁকেছে?'

'স্যার, আমি এঁকেছি।'—দ্বিধাগ্রস্তভাবে আরন কথাগুলি উচ্চারণ করেছিল। সে ভীরুভাবে ঠোঁট চেপে তাকিয়েছিল পরিদর্শকের দিকে; তার চোখে ছিল সহানুভূতিলাভের বিষণ্ণ আকুতি।

সে আবার কথা বলেছিল, এবার কিছুটা বেশি সংলগ্নতার সঙ্গে। 'প্রিন্সিপাল বলেছিলেন যে, শ্বেতাঙ্গের যেমন অধিকার আছে যীশুকে শ্বেতাঙ্গ-রূপে আঁকার তেমনই কৃষ্ণাঙ্গের অধিকার আছে তাঁকে কৃষ্ণাঙ্গরূপে আঁকার। তিনি আরো বলেন···' এইখানে এসে সে যেন কথার সন্ধানে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। একটা ভ্যাবাচাকা খাওয়া ভাব তার গভীর কালো মুখের দ্যুতি দিয়েছিল কমিয়ে। সে তোত্‌লার মতো আরো কয়েকটি কথা বলে আবার থেমে গিয়েছিল।

পরিদর্শক কয়েক পা এগিয়ে এসেছিলেন তার দিকে। অবশেষে তাঁর ক্ষীণ মুখে কিছুটা রক্ত সঞ্চার হওয়ায় সে-মুখের প্রাণহীন ভাবটা কেটে গিয়েছিল।

তিনি রাগতভাবে বলেছিলেনঃ 'বেশ, বলে যাও।···আমি এখনো শুনছি।'

আরন করুণভাবে ঠোঁট নাড়লেও আর কোনো কথা বেরুল না তার মুখ থেকে। তার চোখদুটি সারা ঘরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত কিছুটা আশার ভঙ্গিতে এসে থেমেছিল নিগ্রো প্রিন্সিপালের মুখের উপর। এক মুহূর্ত পরে অনুতাপের সঙ্গে সে মুখ ফিরিয়েছিল যেন সে যা বলেছিল তাতে তার ও প্রিন্সিপালের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার আভাস ধরা পড়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপাল স্কুলের সেরা ছাত্রের সমর্থনে এসেছিলেন এগিয়ে।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেনঃ 'আমিই ছেলেটিকে ওই ছবি আঁকায় উৎসাহ দিয়েছিলাম। এবং আমার অনুমতি নিয়েই ও চিত্রটি স্কুলে এনেছিল। আমি মনে করি যে ছেলেটি খিস্টকে কালো করে এঁকে বিশেষ একটা ভুল করে নি। অন্যান্য সকল জাতির শিল্পীরা তাঁদের পূজিত ঈশ্বরকে নিজেদের অনুরূপ করেই এঁকেছেন। আমরা কেন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হব তার কারণ আমি খুঁজে পাই না। আর যাই হোক, খিস্ট

পৃথিবীর এমন একটা এলাকায় জন্মেছিলেন যেখানে প্রধানত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরই বাস। তিনি নিগ্রো ছিলেন এরূপ একটা প্রবল সম্ভাবনা আছে।'

একঘেয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ না থাকলে আমি হলফ করে বলতে পারতাম যে তাঁর কথাগুলি হলের সকলকে থামিয়ে দিয়েছিল। আমি এই ক্ষুদ্রাকৃতির প্রিন্সিপালকে সাদা-কালো কারো সঙ্গে এত সাহসের সঙ্গে কথা বলতে দেখি নি।

পরিদর্শক হতভম্ব হয়ে ঢোঁক গিলেছিলেন। নিঃশব্দ রাগে তাঁর মুখ টকটকে হয়ে উঠেছিল।

তিনি কঠিনভাবে নিগ্রো প্রিন্সিপালকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'আপনি কি এইসব ছেলেমেয়েকে এই ধরনের বিষয়ই শেখাচ্ছেন?' প্রিন্সিপাল বললেন: 'আমি ওদের শেখাচ্ছি যে তাদের জাতিতে যেমন বড় বড় রাজা-রানী জন্মেছে তেমনি জন্মেছে ক্রীতদাস। পৃথিবীকে এ-কথা জানানোর সময় অনেকদিন অতিক্রান্ত হয়েছে যে ইয়োরোপের লোকদের লিখিত ভাষা সৃষ্টির অনেক আগে আমরা চমৎকার একটি সভ্যতা গড়ে তুলেছিলাম এবং সে-সভ্যতার সুযোগ ভোগ করেছিলাম।'

পরিদর্শক কাশলেন। তাঁর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটি যেন ভীতিজনক ভাবে বড় হয়ে উঠল। 'আপনাকে তো এই স্কুলে এই সব শিখানোর জন্যে মাইনে দিয়ে রাখা হয় নি। আপনি প্রিন্সিপাল হিসাবে আপনার অধিকার বহির্ভূত কাজ করেছেন বলে আমি আপনার পদত্যাগের দাবী জানাচ্ছি।'

জর্জ দুভল কথা বললেন না। তাঁর গম্ভীর মুখ কড়া কম্পনে নড়ে উঠল। তিনি উপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের অফিসের দিকে চলে গেলেন।

তিনি ঘরের বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত পরিদর্শকের দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করল। তারপর তিনি নিশ্বাসে হিস্ হিস্ করে বললেন: 'লোকেরা যদি ভাবতে শুরু করে যে খ্রিস্ট কৃষ্ণকায় ছিলেন তাহলে পৃথিবীতে একটা দারুণ গণ্ডগোলের সূত্রপাত হবে।'

কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাও প্রিন্সিপালকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর পিছনে পড়ে থাকা হতভম্ব ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারল না তারা এর পরে কি করবে। পরিদর্শক আমার পিছনেই ছিলেন আর আমি তাঁকে নিজের মনেই গজরাতে শুনলাম: 'নিপাত যাক্, কালো মানুষগুলো দেখছি বেশি চালাক হয়ে উঠছে।'

কয়েকদিন পরে আমি শুনলাম যে প্রিন্সিপাল দক্ষিণ জর্জিয়ার কোনো

একটি ছোট হাই স্কুলে শিল্প-শিক্ষকরূপে গ্রীষ্মকালের জন্যে একটি চাকরি নিয়েছেন এবং তিনিও যাতে শিল্পকর্মে আরনকে উৎসাহ দিয়ে যেতে পারেন সে জন্যে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি পেয়েছেন তার বাপ মায়ের কাছ থেকে।

আমি বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পেলাম তিনি অফিস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি বগলের নিচে কতকগুলি বই এবং হাতে একটা বড় ব্রীফকেস নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই বিদায় নিয়েছিলেন সব শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে। আশ্চর্যের কথা তাঁকে দেখে ভগ্ন-মন বলে মনে হচ্ছিল না। সম্মুখের বড় দরজাটার দিকে এগোতে এগোতে তিনি তাঁর চোখের চশমা ঠিক করে নিলেন কিন্তু পিছন দিকে তাকালেন না। তাঁর সৈনিকের মতো পদক্ষেপকে আরো মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছিল একটি বিজয়-লাভের ভঙ্গি। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি এমন-একটা বড় কাজ করেছিলেন যা কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

আরন ক্রফোর্ড বাইরে তাঁর জন্যে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা দু জনে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলেন। তিনি সস্নেহে আরনের গলা জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি অকৃত্রিমভাবে আরনের সঙ্গে কিছুটা কথা বলছিলেন এবং আরন শুনছিল গভীর মনোনিবেশ সহকারে।

আমি তাঁদের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম—অবশেষে মূর্তি দুটি অস্পষ্ট হয়ে উঠল। এতটা দূরত্ব থেকেও আমি দেখলাম যে কোনো কিছুতে বিজয়ী দুটি মানুষের মতো তাঁরা তখনো এগিয়ে চলেছিলেন দ্রুত, মর্যাদাসম্পন্ন পদক্ষেপে।

[The Boy who painted Christ black] অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক

স্যাণ্টা ক্লস্ মানুষটি সাদা

জন হেনরিক্ ক্লাক

তার মা যে বাড়িতে কাজ করত সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তার কী আনন্দ! মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জীবনে এই প্রথম একটা আস্ত কোয়াটার (?) দিয়ে বলেছে, 'বড়দিনের জন্যে কিছু কেনাকাটা করে এসো। বাবার জন্যে, বাচ্চাটার জন্যে আর লিল্ পিসীর জন্যে কিছু কিনবে। মার জন্যেও কিছু এনো, অবশ্য যদি পয়সা বাঁচে।'

তার ভাগ্যে জোটা এই অর্থ কী ভাবে ভাগ করবে সেটা ইতিমধ্যেই সে ঠিক করে ফেলেছিল। বাবার জন্যে কিছু কিনতে একটি নিকেল, বাচ্চাটার জন্যে একটি নিকেল আর, লিল্ পিসীর জন্যে আরেকটি নিকেল সে খরচ করবে। বাকি দশ সেন্টের সবটা দিয়ে দশ-সেন্ট-স্টোর থেকে মায়ের জন্যে কিনবে সুন্দর ঝলমলে মুক্তোর মালাজাতীয় একটা কিছু।

তার বেঁটে শক্ত পা-দুটোকে সে তাড়াতাড়ি বাজারপট্টির দিকে চালিয়ে দিল। এই মাঝ-ডিসেম্বরেও দক্ষিণে হেলা সূর্যের তাপে তার কালো মুখটা ঘামে ভিজে উঠেছিল। আজ কিন্তু সে খুশি···ভীষণ খুশি। সে হাঁটছিল নিশ্চেষ্ট আর উদাসভাবে। তার নিজেকে হালকা ও মুক্ত মনে হচ্ছিল। বাতাস যেন তাকে স্বর্গের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে—এত উপরে যেখানে সকলেই তাকে দেখতে পাবে আর চিনতে পারবে এ সেই লুসিয়ানার সবচেয়ে সুখী ছোট্ট কালো ছেলে র‍্যামডলফ্ জনসন।

বাজারপট্টির সীমান্তে যেখানে শহরের গরীব সাদা মানুষের বাস, ঠিক সেখানে এসে সে তার গতি মন্থর করল। সহজাত চেতনা দিয়েই সে বুঝতে পারছিল, যদি সে দৌড়ায় যে-কোনো সাদা মানুষ তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করতে পারে; আবার যদি খুব ধীরে হাঁটে তবে কোনো-কিছু চুরির চেষ্টা করছে এমন অভিযোগ উঠতে পারে। সে ভয় ভয় চোখে এদিক-ওদিক

তাকিয়ে সতর্কভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে সুরু করল। বড়দিন উপলক্ষ্যে কেনাকাটা করার আনন্দ সাময়িকভাবে কিছুটা চাপা পড়ে গেল।

কার্ডবোর্ড চিমনির পাশে ছোট একটা ঘন্টা নাড়াচ্ছে এমন-একজন নোংরা স্যান্টা ক্লস্‌কে সে পার হয়ে গেল। সেই লম্বা মোটা নকল দাড়ি গোঁফ-ওয়ালা লোকটি তার দিকে চেয়ে হাসলেও সে কোনোরকম ইতঃস্ততঃ করল না। সপ্তাহ কয়েক আগে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বড় বিভাগীয় বিপণিতে সে দেখেছে একজন সত্যিকারের স্যান্টা ক্লস্‌কে। সে যা যা চায় তাকেই সব বলেছিল। এই বিসদৃশ নোংরা লোকটি হয়তো স্যান্টা ক্লসের সহকারি কিন্তু এই নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় তখন তার ছিল না।

কিছুদূর এগিয়ে সে সাদা ছেলেদের একটি দলকে দেখতে পেল। ঐ দুষ্ট ছেলেগুলি রাস্তার ধারের একটি ফলের দোকানের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তার দৃঢ় ধারণা, তারা আপেল চুরি করছিল। সে দেখল, সাদা এপ্রোন-পরা দোকানের মালিকের তাড়া খেয়ে তারা ভীত এক-ঝাঁক পাখীর মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কয়েক শো ফুট দূরে আবার জমায়েত হল।

এই দলটির পাণ্ডার দৃষ্টি তার উপর পড়তেই তার সারা দেহে আতঙ্কের শিহরণ ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ে সে আড়ষ্ঠ হয়ে উঠল। তার দ্রুত পদক্ষেপ হয়ে এল মন্থর ও সাবধানী। ঐ নোংরা সাদা ছেলেদের দলটিকে এড়ানোর জন্যে সে রাস্তা পার হয়ে ওপারে যাওয়ার কথা চিন্তা করল।

যেই সে রাস্তা পার হওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছে, অমনি দলের পাণ্ডাটির কর্কশ আদেশ ধ্বনিত হল, 'এই ছোকরা, এদিকে আয়।'

একটা অস্বস্তিজনক ভয় তার মধ্যে জেগে উঠল। তার চোখদুটি বড় বড় হয়ে উঠল এবং হঠাৎ এক ধরনের অস্থিরতায় তার শরীরের প্রত্যেকটি পেশী কাঁপতে শুরু করল। সে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে মানুষের একটা দেওয়াল তাকে ঘিরে ফেলেছে। সে ফুটপাথের দিকে পিছু হটতে বাধ্য হল। যতবারই সে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল ততবারই ওই দলের নেতা লালচুলওয়ালা ছেলেটি তাকে ধাক্কা দিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছিল।

সে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকে ঘিরে-থাকা ভিড়টা দেখছিল আর আশ্চর্য হচ্ছিল পথচারী বয়স্ক লোকদের ও ছোটদের এই নিষ্ঠুর খেলায় যোগ দিতে দেখে। সে পিছনে দৃষ্টি চালিয়ে ঘন্টা হাতে স্যান্টা ক্লসের দিকে আশাভরা চোখে তাকাল। কিন্তু তাকেও নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে এই দৃশ্য উপভোগ করতে দেখে সে আরো আশ্চর্য হল।

সে বুঝতে পারল দলটি তাকে স্বেচ্ছায় ছেড়ে না দিলে তার মুক্তির কোনো

পথ নেই। তাই সে ভয় কাটিয়ে সাহসী মন নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তার ঠোঁট দুটি শুকিয়ে উঠেছে, ঘামের ধারায় তার গোল কালো মুখমণ্ডলে একটা দারুণ ছায়া পড়েছে। সে কিছুই চিন্তা করতে পারছে না, সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

লালচুলওয়ালা ছেলেটিই নিঃসন্দেহে দলের পাণ্ডা। তার চেহারার মধ্যে এমন-একটা শক্ত সমর্থ ও তেজী ভাব ছিল যা তাকে দলের অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করেছে। অতঃপর সে কি করে দেখার জন্যে দলের সকলে অধীর হয়ে উঠেছিল। পাণ্ডা ছেলেটি বিশ্রী ঢঙে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বলল, 'এই নিগ্রোর বাচ্চা, কোথায় চলেছিস? জানিস না কোনো নিগ্রোকে আমারা এদিকে যাওয়া-আসা করতে দিই না?'

যতটা কর্কশভাবে সে কথাগুলি বলবে মনে করেছিল তার গলার স্বরে সে কিন্তু ততটা কর্কশতা আনতে পারে নি। তার ব্যক্তব্যটা দুর্বল অভিনয়ের মতো শুনিয়েছিল।

ছোট কালো ছেলেটি নম্রভাবে জবাব দিল, 'একটু দশ সেন্টের দোকানে যাচ্ছি বড়দিনের কেনাকাটা করতে।'

এই কথা বলে পালানোর কোনো সুযোগ পাওয়া যেতে পারে কি না দেখার জন্যে সে চটপট ভিড়টাকে একবার যাচাই করল। কিন্তু সে তখন পুরোপুরি ঘেরাও হয়ে রয়েছে। তার চারিদিকে মানুষের দেওয়াল আরো ঘন হচ্ছে! অস্থির, কৌতূহলী মানুষগুলি তার ভয়-পাওয়া চেহারা দেখে হাসছে। তাদের হাসি ও অবজ্ঞা সবটাই একটা ছোট কালো ছেলেকে ঘিরে, যে কোনো অন্যায় বা কারুর কোনো ক্ষতি করে নি।

সে কাঁদতে সুরু করল; বলল, 'আমি কিছু করি নি, দয়া করে আমাকে যেতে দাও।'

দলের মধ্যে একজন ছেলে বলল, 'এই, ওকে যেতে দাও।' হাসির তোড়ে তার এই সৎ পরামর্শ ভেসে গেল। লালচুলওয়ালা ছেলেটি হাত তুলে অন্যদের শান্ত করে বলল, 'বন্ধুগণ, এক মিনিট অপেক্ষা কর। এই নিগ্রোর বাচ্চা যখন কেনাকাটা করতে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই ওর কাছে পয়সা-কড়ি আছে। কত আছে ওর কাছে আমরা দেখতে পারি।'

ছোট কালো ছেলেটি জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে শক্ত মুঠিতে কোয়ার্টারটা ধরে রইল। ভিড়ের বাইরে সে কোনো একটা সহানুভূতিশীল মুখের খোঁজ করছিল। একমাত্র স্যাণ্টা ক্লজের পোশাকে সেই মোটা সাদা লোকটিকেই সে দেখতে পেল, যাকে সে একটু আগে পার হয়ে এসেছে। স্বল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন কোনো অভিশপ্ত ব্যক্তির মতো এই বিচিত্র নকল দাঁড়িগোঁফওয়ালা

লোকটিকে তার বিশাল বপুখানি হেলিয়ে দুলিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

কালো ছেলেটিকে ঘিরে-ধরা ভিড়ের মাঝখানে পৌঁছে সে লালচুলওয়ালা ছেলেটিকে একহাতে সরিয়ে দিয়ে অন্য হাতে তার দাড়িগোঁফ খুলে ফেলে গোটা পরিস্থিতির নেতৃত্ব নিজের হাতে নিল।

'এই নিগ্রোর বাচ্চা, তোর নাম কি?' সে প্রশ্ন করল। কালো ছেলেটি অতি কষ্টে ঢোঁক গিলল। ভয় পাওয়ার চেয়ে সে স্তম্ভিত হয়েছিল বেশি। জীবনে কখনো সে কল্পনাও করে নি যে ছেলেমেয়েদের দরদী বন্ধু স্যাণ্টা ক্লস্ অথবা তার কোনো সহকারি এমন-একটা ভূমিকা নিতে পারে।

'আমার নাম র‍্যানডলফ্,' সে কোনো রকমে বলল। ছেঁড়া লাল পোশাক-পরা লোকটির চিমড়ে মুখ হাসিতে কুঁচকে গেল। বিদ্রূপে চিৎকার করে বলে উঠল, 'র‍্যানডলফ্! নিগ্রোর বাচ্চার এত সুন্দর নাম হতে পারে না। কোনো নিগ্রোর এমন সুন্দর নামের অধিকার নেই।' তারপর তার চওড়া হাতে ছেলেটির কাঁধে সজোরে চাপড় মেরে বলল, 'এখন থেকে, ব্যাটা, তোর নাম রইল জেম।'

তার রূঢ় কণ্ঠস্বর ভিড়ের অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে গর্জন করে উঠল। ছেলেগুলির মুখে চাপা হাসি দেখা দিল। মুখোশ খুলে ফেলা স্যাণ্টা ও কালো ছেলেটিকে ভালো করে দেখবার জন্য তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল।

কালো ছেলেটি তাদের বিরূপ চাউনির তীব্রতায় ক্রমশ যেন কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ঘামের সঙ্গে চোখের জল মিশে তার গোল কালো মুখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। অসাড়তা তার দেহকে গ্রাস করছিল।

'আমি কি এখন যেতে পারি?' সে অনুনয় করল। তার ক্ষীণ করুণ স্বর প্রায় শোনা যাচ্ছিল না। 'আমার মা আমাকে সোজা দশ সেণ্ট স্টোরে যেতে বলেছে। আমি তো কারুর কিছু করি নি।'

'তুই কান্না না থামালে মেরে সোজা তোকে স্বর্গে সেণ্ট পিটারের কাছে পাঠিয়ে দেবো', মোটা সাদা লোকটি ক্রোধ ও বিরক্তির সঙ্গে বলল। তার গলার শিরাগুলি কেঁপে উঠল, মুখের বিশ্রী রঙ কিছুটা পাল্টে গেল। সে এইমাত্র যা বলেছে তা পুনর্বিবেচনা করে দেখছে, এমন-একটা ভাব নিয়ে সে আবার বলল, 'না, মনে করিস্ না আমরা তাই করব।' তা ছাড়া, মনে হয় না সেণ্ট পিটার তোর মতো নিগ্রোদের নিয়ে কারবার করবে।'

ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠল। তাদের হাসির ধমক কমলে লাল পোশাক-পরা লোকটি ছোট নিগ্রো ছেলেটির কাছে সরে এসে অধৈর্য ও অস্থির-সঙ্কল্প জনতার দিকে তাকাল।

ছেলেদের মধ্যে একজন চিৎকার করে জানাল, 'ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক। লিঞ্চ করা হোক।'

'হ্যাঁ ওকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক,' আরেকজন আরো চিৎকার করে ও জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

কথাগুলি যাদুর মতো কাজ করল ও নিমেষে ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রূপাত্মক হাসির সঙ্গে মিশে গেল অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত বিচিত্র শব্দসমষ্টি।

ছেলেটির কালো মুখ জুড়ে ফুটে উঠল যন্ত্রণার ছায়া। মরীয়া হয়ে আর একবার সে একটি সহানুভূতিশীল মুখের খোঁজ করল।

'এস, ব্যাটাকে মেরে ফেলি', কথাকয়টি ততক্ষণে গানে পরিণত হয়েছে। সেই গান ডিসেম্বরের বাতাসে-বাতাসে অনুরণিত হয়ে রাস্তার গাড়িঘোড়ার শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে।

'আমি একটা দড়ি নিয়ে আসি', লালচুলওয়ালা ছেলেটি বলল। তারপর ভিড় কেটে পথ করে বেরিয়ে যেতে-যেতে উল্লসিত কণ্ঠে জানাল, 'আমি ফিরে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা কর।'

ধীরে-ধীরে ভিড়ের উপর একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার ভীত ছেলেটির দিকে আর একবার স্যান্টা ক্লসের পোশাক-পরা মোটা লোকটির দিকে তাকাচ্ছিল।

মোটা লোকটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'এই, তোর পকেটে কী আছে?'

ভয়ে ছেলেটি দ্রুত পকেট থেকে হাত বার করে পিছনে লুকাল। সাদা লোকটি ছেলেটির ডান হাতখানা জোর করে খুলে যা দেখল তাতে খুশিতে তার চোখদুটি চকচক করে উঠল।

'আহা! একটা কোয়াটার! এখন বল্ নিগ্রোর বাচ্চা, কোথা থেকে এটা চুরি করেছিস?'

'আমি চুরি করি নি, আমার মা আমায় দিয়েছে', ছেলেটি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

'মা দিয়েছে, অ্যাঁ?' কিছুক্ষণ আগের স্যান্টা ক্লস্ ধমকে উঠল। সে কোয়াটারটি তার লাল পোশাকের পকেটে পুরে ফেলল। 'সাদা মানুষরা যখন অনাহারে মরছে তখন কালো মানুষদের কাছে পয়সা থাকা মোটেই উচিত নয়। আমি কোয়াটারটি আমার জন্যে রাখলাম', সে বলল।

কালো ছেলেটির কপালে ফুটে উঠল গভীর দুশ্চিন্তার রেখা। অসহায়ের মতো সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চারপাশের ভিড় অস্পষ্ট মনে হল তার চোখে।

যতদূর তার দৃষ্টি যাচ্ছিল তার সামনে শুধু সাদা মানুষ আর সাদা মানুষ। তারা সকলেই সমর্থন জানাচ্ছে সেই বিসদৃশ স্যান্টা ক্লস্‌কে। অপুষ্ট ছেলেমেয়েদের দাগভর্তি মুখগুলি হাসিতে উজ্জ্বল হল। নোংরা পোশাক-পরা লোকগুলি দোক্তা-খাওয়া দাঁত বার করে হাসছিল। প্রসাধনহীন দাগ-ভর্তি মুখের মেয়েরা বাড়ির ময়লা পোশাকে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ লাল জামাপরা লোকটি সকলকে চুপ করবার জন্যে হাত তুলল। ছোট কালো ছেলেটির দিকে একনজর তাকিয়ে তার মুখে নতুন একটা ভাব দেখা দিল। ঠিক দয়ার ভাব নয়, এক ধরনের বিরক্তির, জনতা কিছুটা শান্ত হলে সে বলল, 'বন্ধুগণ', একটু ইতঃস্তত করে আবার সুরু করল, 'আমার মনে হয়, এই ছোকরা মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার পক্ষে নিতান্তই বাচ্চা···তা ছাড়া এটা বড়দিনের সময়···মানে, ক্রিস্‌মাস্‌ আগতপ্রায়।'

একজন মোটা লোক মৃদুস্বরে তাকে সমর্থন জানিয়ে বলল, 'হাঁ ঠিকই, এটা ঠিক উপযুক্ত সময়ও নয় কারণ এখনো তেমন শীত পড়ে নি। এই সময় ওকে মেরে ফেললে এদিকের আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাবে।'

ভিড়ের মধ্যে একটা হতাশার গুঞ্জন উঠল। কেউ-কেউ হাসল, কেউ কেউ প্রতিবাদমুখী হয়ে লালজামাপরা লোকটির দিকে তাকাল। এই সিদ্ধান্তে তারা কেউই বিশেষ খুশি হল না।

লালচুলওয়ালা ছেলেটি একগাছি দড়ি নিয়ে ফিরে এল। ততক্ষণে কিন্তু 'এস, ব্যাটাকে মেরে ফেলি' গানটা থেমে গেছে, দড়িটা সে সাদা মানুষটির হাতে দিল।

শুকনো ও কাঁপা-কাঁপা গলায় দড়িটা হাতে নাচাতে-নাচাতে সাদা মানুষটি তাকে বলল, 'বৎস, আমরা দুঃখিত।' তার সিদ্ধান্তটি সঠিক হয়েছে কিনা তার নিজেরই প্রত্যয় ছিল না। তবু সে বলে গেল, 'আমরা ঠিক করেছি ওকে আজই মৃত্যুদণ্ড দেব না। ও এখন খুবই বাচ্চা, মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার মতো বড় হয় নি। তা ছাড়া 'আবহাওয়া এখন বেশ উষ্ণ রয়েছে। ওকে আরো কিছুদিন বাঁচতে দেওয়া যাক! পরে হয়তো আমরা ওকে আবার বাগে পাব।'

লালচুলওয়ালা ছেলেটি ভ্রূকুটি করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'এই কথা! অথচ দড়ি গাছিটা যোগাড় করতে আমায় কম কষ্ট করতে হয় নি।'

ক্ষিপ্তভাবে সে কালো ছেলেটিকে আঘাত করতে উদ্যত হল। ছেলেটি ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। বিসদৃশ স্যান্টা ক্লস তাদের দু জনের মধ্যে এসে পড়ে বলল, 'বৎস, একটু থামো···এই দেখ।' সে তার জামার পকেট থেকে কোয়াটারটা বার করে ক্রুদ্ধ লালচুলওয়ালা ছেলেটিকে দিল।

সাদা ছেলেটির মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল ও মুহূর্তে তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ল। কোয়াটারটি তার হাতের চেটোতে উলটে-পালটে দেখে নিয়ে সকলে যেন দেখতে পায় এমনভাবে উঁচু করে সেটিকে ধরে বলল, 'অবশ্যই স্যাণ্টা ক্লস্ বলে কেউ আছে।'

জনতা হো-হো শব্দে হেসে উঠল।

কালো ছেলেটি তখন বিশাল ভিড়ে ঘেরাও হয়ে আছে। তখনো সে হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মনমরা হয়ে সে ফঁুপিয়ে-ফঁুপিয়ে কাঁদছে। ওরা কেড়ে নিয়েছে তার সৌভাগ্যের ধন, তার সম্পদ, তবু তার কিছু করার নেই। সে বুঝতে পারছিল না স্যাণ্টা ক্লস্ সম্পর্কে এখন সে কী ধারণা করবে।

সে দেখতে পেল ভিড় পাতলা হচ্ছে। শীঘ্রই একটা পথ হতে পারে যার মধ্যে দিয়ে সে দৌড়ে পালাতে পারবে। এমন-একটা সুযোগ পেয়েই সে ছুট দিল। প্রতি পদক্ষেপে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে তুলে তার ক্ষুদে পা দুটি যতটা জোরে তাকে বহন করতে পারে ততটা জোরে সে ছুটছিল।

এতসব ঘটনার নাটের গুরু সেই লালচুলওয়ালা ছেলেটি তাকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ল কিন্তু সেটা তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাল না। অন্যান্য ছেলেরা চিৎকার করতে লাগল, 'দৌড়ো, ব্যাটা নিগ্রোর বাচ্চা, দৌড়ো।' কিছুক্ষণ আগের স্যাণ্টা ক্লস্ এই ফাঁকে তার মুখোশটা এবং দাড়ি-গোঁফ ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল।

পিছনের সম্মিলিত বিদ্রূপ ও হাসি এক অদৃশ্য শক্তির মতো ছোট কালো ছেলেটিকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাদা মানুষগুলি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল যতক্ষণ না ছেলেটি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হল।

কিছুক্ষণ দৌড়িয়ে তার পা-দুটি ক্লান্তিতে ভারি হয়ে উঠলে তার পদক্ষেপ মন্থর হল। একটু পরেই সে বাড়ির রাস্তা পেল।

বিমূঢ়ভাবে শূন্য হাতের দিকে চেয়ে মায়ের দেওয়া চকচকে কোয়াটারটার কথা তার মনে পড়ল। তার ডান হাত শক্ত মুঠি করে সে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করল সেটি এখনো আছে। কিন্তু তাতে শুধু কষ্টই বাড়ল।

ধীরে ধীরে তার মুখ থেকে ভয় ও দুশ্চিন্তার কালো মেঘ সরতে লাগল। এখন সে তার প্রতিবেশীদের মাঝে চলে এসেছে। ওরা তার চেনা-জানা। নিজেকে তার শক্তিশালী ও ভাবনামুক্ত মনে হল। চেনা মানুষগুলি তাকে সাহাস্যে সম্ভাষণ জানাচ্ছিল। সূর্যের তাপে তার চোখের জলও তখন শুকিয়ে গেছে।

সে ঠিক করল তার চরম দুর্দশার কথা মা ছাড়া কাউকে জানাবে না। মা হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে পারবে এবং তাকে আরেকটা কোয়াটার দেবে, নয়তো কেনাকাটার কাজটা মা নিজেই সারবে। কিন্তু স্যান্টা ক্লসের ঐ ভয়ঙ্কর রূপ সম্পর্কে মা কী বলবে! সে ঠিক করল মাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। দুনিয়ায় এমন কিছু-কিছু ব্যাপার আছে যা কেউই, এমন-কি মায়েরাও, ঠিকমতো ব্যাখ্যা করতে পারে না।

[Santa Claus is a White Man] অনুবাদ : বিজন ঘোষ

গাঁদা

ইউজেনিয়া কোলিয়ার

যখন আমি যৌবনকালের আমার দেশের সেই শহরের কথা ভাবি, তখন শুধুই মনে পড়ে কেবল ধুলোর কথা, শেষ গ্রীষ্মের শুকনো রৌদ্রদগ্ধ ধুলো—যা চোখে লাগত আর জল বের হত, ধুলো খালি পা দুটোয় বোঝাই হয়ে যেত, কখনো আটকাতো গলায়। কেন জানি না শুধু ধুলোর কথাই মনে হয়! অথচ টাটকা সবুজ ঘাসের বাগানও তো ছিল, পাতাওয়ালা গাছের বীথি ছিল পথের দুধারে। স্মৃতি যেন আবছায়া ছবির মতো, কখনোই যথাযথকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে পারে না, একটা অনুভবের জগৎ তৈরি করে শুধু। যখনই আমি যৌবনের এবং যৌবনের সেই শহরের কথা ভাবি, তখন কেবলই নিরস সেপ্টেম্বরের ধুলোয় ধুসকুড় রাস্তাগুলি আর তৃণহীন উদ্যানযুক্ত সেই শহর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এখানেই আমি থাকতাম। আর একটা জিনিস মনে পড়ে—এই স্মৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না—ধুলো নয়, বরং ধুলোর বিবর্ণতার পাশে সূর্যকরোজ্জ্বল হলুদের কিছু আভা, অর্থাৎ মিস্ লট্টির গাঁদা ফুলের কথা মনে পড়ে।

ঐ গাঁদা ফুলের কথা মনে পড়লেই ফেলে আসা দিনের জন্যে বড় মন কেমন করে, ফুলের ছবি মুছে গেলেও হারানো দিনের জন্যে এক আর্তি পেয়ে বসে। কিশোর বয়সের স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনগুলির কথা মনে পড়ে, ধোঁয়া-ধোঁয়া, অলীক মায়াময় চেহারায় যেন তারা হাজির হয়। মিস লট্টির বাগানের কথা—চোদ্দ বছর থেকে পনেরোয় পা দিয়েছি সবে, কখনো মনে রাগ জমত কখনো উড়তাম খুসির হাওয়ায়, কখনো আনন্দ, কখনো-বা লজ্জা বোধ হত, মনে হত আমি আর খুকি নই, নারীত্বের একটা অনুভূতি এসে জড়াতো আমাকে। সেই সময়—সেই অদ্ভুত সময়ের গাঁদা ফুলগুলি মনে পড়ছে। এখন আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই গাঁদা ফুল—যখন আমি

তোমার প্রতীক্ষায় সময় কাটাচ্ছি, জানি তুমি আসবে না, তবু গাঁদা ফুলের কথা মনে পড়ছে!

আমার কৈশোরকালে আমাদের দরিদ্র জাতির পক্ষে অসার প্রতীক্ষা যেন আবহসংগীত, যেন ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড মিউজিক। জাতির যে দুর্দশা—তা তো আমাদের কাছে কোনো অজানা বস্তু নয়, 'মেরীল্যাণ্ড' গ্রামের কালো শ্রমিকেরা নৈরাশ্যপীড়িত। আমি জানিই না—কি জন্যে, কিসের জন্যে, অপেক্ষা করছি; নিশ্চয়ই শ্বেত আদমির আওড়ানো বুলি—'ঐ দিকে ঐ কোণে' সমৃদ্ধি আছে, শোনার জন্যে নয়, কারণ ও কথা কোনোদিনই বিশ্বাস করি নি। আমরা কঠোর খাটুনির জন্যেও খুব বেশি অপেক্ষা করি নি, আমেরিকানদের প্রতিশ্রুতি মতো উজ্জ্বল সাফল্যের দোরেও যাই নি। বোধহয় আমরা অপেক্ষা করেছিলাম কিছু আশ্চর্য ঘটনার জন্যে, দৈব কোনো ব্যাপারের জন্যে, নিরাকার কোনো দৈব ঘটনার প্রত্যাশাই অনিবার্য ছিল, কেন না প্রত্যুষে উঠে সাদা মানুষের আঙুরলতার বাগানে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত কাজ করলে, বা সেপ্টেম্বরের ধুলোয় সামান্য কয়েক টুকরো রুটির বদলে কপালের ঘাম পায়ে ফেলতে গেলে—দৈব কোনো কিছুর স্বপ্ন দেখতেই হয়। ভগবান তখনকার দিনে আশ্চর্য কিছু করতেনই—তাই আমরা প্রতীক্ষা করতাম। শুধু প্রতীক্ষাই করতাম।

আমরা—ছোটরা—আমাদের দারিদ্র্য যে কী রকম এবং কতদূর বিস্তৃত—তা বেশ বুঝতাম। রেডিও ছিল না, ছিল না কোনো পত্র-পত্রিকা, দৈনিক-কাগজও তেমন নয়, ফলে বাইরের জগতের কোনো খবরই জানতাম না। এখন হলে আমাদের বলা হত সংস্কৃতির জগতে অসভ্য, লোকে আমাদের নিয়ে বইও লিখত। কিন্তু তখন আমরা যাদের জানতাম, তাদের জানতাম আমাদের মতোই গরীব, ক্ষুধার্ত, ছেঁড়া জামাকাপড় পরা। দারিদ্র্যের খাঁচায় আমরা সবাই পোরা ছিলাম, আর মনে ছিল অসহায় একই গুমরানি—ঠিক যেন চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ মরালের মতো, যে জানে যে প্রকৃতি তাকে স্বাধীনভাবে উড়তে বেড়াতে দিয়েছে, অথচ আটকে পড়েছে সে!

সেদিনের কথা মনে পড়লে তীক্ষ্ণভাবে গ্রীষ্মের শেষ ভাগের কথা মনে পড়ে, সেই শুকনো উজ্জ্বল দিন—যার পরই শীতের আসন্ন পদধ্বনি শোনা যাবে।

তখন আমি চোদ্দ বছরের; বাড়িতে ছোটর মধ্যে শুধু আমি আর আমার ভাই জোয়ে। বড়রা বিয়ের ব্যাপারে কিম্বা শহরের লোভে বাড়ির বাইরে গেছে, আর ছোট্ট দুটি শিশুকে আত্মীয় বাড়িতে পাঠানো হয়েছে, আমাদের চেয়ে তারা বেশি যত্ন করবে তাদের এই ভেবে। জোয়ে আমার চেয়ে তিন

বছরের ছোট, একেবারে ছেলেমানুষ। মা বাবা রোজ সকালে ময়লা রাস্তা ধরে কাজে যায়, মা যায় সংসারের কাজ সারতে, বাবা কাজের সন্ধানে, ব্যর্থ হয়ে ঘুরে আসে। জোয়ে আর আমি আমাদের ভাঙাচোরা দরিদ্র কুটীরের আশেপাশে রোদে দৌড়োদৌড়ি করতাম। পাড়ার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দশা ঐ আমাদেরই মতো।

সেসব দিনের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে নেই। জলরঙা ছবি বৃষ্টিতে ভিজলে যেমন ঝাপসা হয়ে যায়—আমার স্মৃতি তেমনি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। রোদে রাস্তায় বসে ধুলোর উপরে এক-একটা ছবি আঁকতাম—মনে পড়ে, জোয়ে পা দিয়ে খুশি হয়ে তা দিত মুছে। মনে পড়ছে খাঁড়িতে মিঠে-জলের মাছ ধরতাম, কখনো-কখনো হাত থেকে ছিটকে পালাত সেই মাছ, জোয়ে জোরে হেসে উঠত। আর মনে পড়ছে, হ্যাঁ, সেই বছর—শরীরে আর মনে এক অদ্ভুত অস্থিরতা, একটা নতুন অনুভূতি এল, পুরানো বোধ, পরিচিত উপলব্ধি হারিয়ে গেল—কেমন একটা অজানা শিহরণ অনুভব করলাম, সেই নতুন বোধ কতকটা যেন ভয়েরও।

একদিন—বোধহয় সেদিনই এই নব-অনুভূতির স্পষ্টতা বুঝলাম, অনির্বচনীয়ভাবে উপলব্ধি করলাম আমার জীবন বদলে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ির কাছে বড় ওকগাছের তলায় বেড়াতে বেড়াতে কি যেন ভাবছিলাম, কি ভাবছিলাম—আজ আর তা মনে নেই, বোধ হয় 'হ্যারিস'-ছেলেদের কথাই চিন্তা করছিলাম। জোয়ে আর কয়েকটি ছোট ছেলে ওক গাছের একটা ডালের ধারে খেলছিল।

জো চেঁচিয়ে ডাকল—'এই এলিজাবেথ—চল আমরা অন্যদিকে যাই।'

চিন্তায় ছেদ পড়ল, আমি বললাম—'কোথায় ?' আমার গ্রীষ্মকালীন দিনগুলির আকৃতিহীনতায় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বসন্তকালের তুলনায় এখনকার দিন অনেকটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

কে একজন বললে—'পাহাড়ে পঙ্গপাল দেখতে পাই কি না—একবার গিয়ে দেখা যাক।'

জোয়ে ঘৃণার সঙ্গে বললে—'ওখানে কোনো পঙ্গপাল নেই, ওখানে সব সবুজ দেখতে পাবে।'

পঙ্গপাল খোঁজার যুক্তি টিঁকল না, জোয়ে শেষে বলল—'চল, আমরা সবাই লটির ওখানে যাই।'

কথাটা সকলের মনে ধরল। লটিকে রাগাতে বেশ মজা লাগে। মিস লটি যেখানে থাকে, সেখানে যাতায়াত করতে যে নিচু বেড়া ছিল—তা ডিঙোবার বয়স আমার ছিল, আর ঐ বেড়া ডিঙোতে আমাদের জীর্ণ

পোশাকও যেত ছিঁড়ে। আমি ভাবলাম—আমাদের দৃশ্যটা কতকটা বিষাদখিন্ন হাসির পালার মতো ; নানা বয়সের পাঁচ-ছটা ছোট্ট ছেলে, একটা করে পোষাক পরণে, আর মেয়েরা বিবর্ণ মলিন পোশাকে, মাপে হয় ছোট্ট না হয় খুব বড় ; ছেলেদের শুধু প্যাণ্ট-পরা খালি গা, ঘামে ভেজা বুক রোদে চকচক করছে। রুক্ষ পথ বেয়ে আসতে আমাদের পা-গুলো ধুলোয় ভারি হয়ে গেল।

মিস লট্টির বাড়ি যেই দেখা গেল আমরা থেমে পড়লাম আমাদের কৌশল ঠিক করে নেব বলে, কিন্তু আসলে সাহস সঞ্চয় করার জন্যেই থেমেছিলাম। মিস লট্টির বাড়ি সবচেয়ে জীর্ণ ; রোদে বৃষ্টিতে বাড়ির চেহারা যেমন মলিন, তেমনই বিবর্ণ। ছেলেরা তাসের ঘর বানায় যেমন করে, লম্বা পাতলা কাঠগুলো তেমনি করে সাজানো, পেরেক মারা বলে মনে হয় না। ঝড়ে উড়িয়ে নিতে পারে, এমনই আলগা মনে হয়। কিন্তু তবু যে দাঁড়িয়ে আছে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার মনে হয়। বাড়িটার বারান্দা তো নে-ইই, জানলা নেই, সিঁড়ি নেই, চারিদিকে সবুজ ঘাসও নেই। মনে হয় যেন একটা ধ্বংসের চিহ্নবিশেষ।

বাড়ির সামনেটায় একটা ভাঙা শব্দকরা দোলানো চেয়ারে মিস লট্টির ছেলে—জন বার্ক বসেছিল। জন বার্ক ছিল 'মোটা অদ্ভুত মাথার' ছেলে। দোলানো চেয়ারের চিঁ চিঁ শব্দেই সে ঝিম মেরে বসে থাকত দিন রাত। পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া একটা টুপি ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা মাথায় থাকত রোদের আবরণ হিসেবে। জন নিজের স্বপ্নের জগৎ ছাড়া বাইরের আর কোনো খবরই রাখত না। কিন্তু একবার যদি তাকে বিরক্ত করা হয়, তার স্বপ্নের রাজ্যে যদি কেউ ঢুকে পড়ে, তবে ভীষণ রেগে যেত সে, মারধোর করত, আর এমন-এক অদ্ভুত ভাষায় বিড়-বিড় করে অভিশাপ দিত—যার অর্থ শুধু সে নিজেই বুঝত। আমরা ছোটরা—তাকে রাগাবার ফিকির খুঁজতাম, আর তার প্রতিশোধ নেবার ব্যাপার থেকে পালাতাম।

কিন্তু মিস লট্টিই ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে মজার, আবার সবচেয়ে ভয়েরও। মিস লট্টিকে দেখে অন্ততঃ একশো বছরের বয়স্ক বলে মনে হত। তার চেহারা দেখে বোঝা যায় যে সে যৌবনে কেমন লম্বা ছিল, কেমন শক্তি ধরত, এখনো তার চেহারায় সে-সবের কিছু-কিছু ছায়া আছে, অবশ্য শরীরটা একটু ঝুঁকে গেছে, মসৃণ চামড়া রক্তাভ-ধূসর, সুখদুঃখের প্রতি সমান উদাসীন্য—এমন ভাব বজায় রয়েছে তার মুখে। মিস লট্টি আগন্তুক ভালোবাসে না, বিশেষ করে ছোটদের তো নয়ই। সে কখনো নিজের বাসা ও উঠোন ছেড়ে বের হয় না, কেউ তার বাড়িতেও বড় একটা

আসে না। আমরা জানি না কী করে তার চলে, তার আহার্য জোটে কী ভাবে, সে আদৌ কিছু খায় কি না—তাই জানি না। আমরা তার সম্পর্কে কত গল্প বানিয়েছিলাম, সেগুলি কিছু-কিছু বিশ্বাসও করতাম। এখন ডাইনী-বুড়ির কাজকর্ম বিশ্বাস করার থেকে মুক্ত থাকলেও তখন কিন্তু ভয় করত, ঐ ভাঙাচোরা নড়বড়ে বাড়িটা দেখলেই ভয় মনে মাকড়সার জালের মতো পাক খেতে থাকত।

আমি আস্তে-আস্তে বললাম—'ওই দ্যাখ, ওই যে সে রয়েছে, ফুলের সঙ্গে কথা বলছে নাকি?' অতদূর থেকে নিশ্চয়ই আমার কথা শুনতে পাবে না মিস লট্টি।

'হ্যাঁ, ওর দিকে তাকাও—'

মিস লট্টির গাঁদা ফুল বোধহয় ঐ চিত্রের সবচেয়ে অদ্ভুত দৃশ্য। চারিদিকের ক্ষয়িষ্ণু বিবর্ণ দৃশ্যের মধ্যে এই ফুল বড্ড বেমানান। পোড়ো ভাঙা বাড়িটার সামনে ধূলিমলিন উদ্যানে রৌদ্ররাঙা তাজা এমন প্রচুর ফুল—আকস্মিক আনন্দের আমেজ আনে। সারা গ্রীষ্ম ধরে ওই ডাইনী বুড়ি বাগানে বসে ফুলের পরিচর্যা করে। ভাঙা বাড়িটা আরো জীর্ণ, জন বার্ক বসে থাকে নিথর হয়ে আর বুড়ি বাগানের আগাছা সাফ করে ফুলের যত্ন করে—প্রতি গ্রীষ্মেই করে। কেন জানি না, আমাদের ছোটদের সবায়েরই ঘৃণা ছিল ওই ফুলগুলির উপর। ঐ গাঁদাগুলি ঐ জায়গার অনুপযুক্ত ছিল, অমন সুন্দর ফুল এমন কুৎসিত জায়গায় মানায় না। ফুলগুলির যেন কোনো বাণী আছে—যা আমরা বুঝতে পারি নি। বুড়ি বেশ শক্তি দিয়েই আগাছাগুলি দূর করত, ঐ আগাছার জন্যে আমাদের খুবই ভয় করত। পিঠটা উঁচুতে হেলিয়ে, পুরুষ মানুষের টুপি মাথায় দিয়ে বুড়ি গাঁদা ফুলের স্তূপে বসলে হাসির দৃশ্যের মতো মনে হবার কথা, কিন্তু তা হত না, কী রকম যেন মনে হত—তা বুঝিয়ে বলা যাচ্ছে না। কখনো-সখনো ঢিল মারতাম ফুল লক্ষ্য করে, কখনো চেঁচাতাম তার কাছে, তারপর পালিয়ে যেতাম দূরে। তরুণ বয়সে আমরা একটু বিদ্রূপও করতাম তার বয়সকে। আমার মনে আমরা ফুল নষ্ট করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কারো সাহসে কুলোয় নি, এমন কী জোয়ে যে যে-কোনো কাজেই বাহাদুরি দেখানোর বোকামি দেখাত—সেও সাহস করে নি।

জোয়ে তখন হুকুম করলে—'তোমরা ঢিল কুড়িয়ে আনো।'—আমি ছাড়া সকলে গেলও ইঁট কুড়োতে। 'এলিজাবেথ, এদিকে এসো।'

ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।

'তুমি ভয় পেয়েছ, এলিজাবেথ?'

আমি মাটিতে থুতু ফেলে বোঝালাম—না ; বললাম—'তোমরা, ছেলেরা ইট পাটকেল আন, আমি দেখিয়ে দেব কেমন করে ওগুলি ছুঁড়তে হয়।'

আমি আগেই বলেছি—আমরা ছোটরা ঠিক জানি না যে আমরা কী রকম বন্দীদশায় থাকি। কেন যে এ রকম ঠিক করা হল কে জানে। ঢিল কুড়োনো হল খুব তাড়াতাড়ি, আমার দিকে সকলে তাকাতে লাগল—এবার আমি আমার কথা রাখতে ঢিল ছোঁড়া যেন শুরু করি।

মিস লট্টির বাসার কাছ বরাবর যে রাস্তাটা গেছে, তার পাশের ঝোপের ধারে এগোলাম। মিস লট্টি শান্তভাবে বাগানে কাজ করছিল, তার কালো হাত দুটো দিয়ে গাঁদা ফুলের পরিচর্যা করছিল। হঠাৎ 'ঝুপ' শব্দ করে একটা পাথরের টুকরো গিয়ে একটা ফুলের বোঁটায় লাগল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ফুলটাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

ঝোপের দিকে তাকিয়ে ঘাড় উঁচু করে মিস লট্টি চেঁচিয়ে উঠল—'কে রে ? কে ওখানে ?'

ঝোপের মধ্যে আমরা নিচু হয়ে বসে পড়লাম—যাতে আমাদের দেখা না যায়। মিস লট্টি খুব কড়া দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকিয়ে ফের নিজের কাজে ফিরে গেল। তখন জোয়ে আর একটি ঢিল ছুঁড়ে আর একটা ফুল ছিঁড়ে ফেললে।

এবার মিস লট্টি গেল ক্ষেপে, সরু একটা লাঠি হাতে তুলে নিয়ে বলতে লাগল—'যা, তোরা সব, বাড়ি চলে যা—পাজী।' অন্য সব ছেলেরা তখন ইটের টুকরো ছুঁড়তে লাগল, আর মিস লট্টির চেঁচানিকে ভেংচাতে শুরু করলে। ছেলেরা চিৎকার করে বললে, 'ডাইনী বুড়ি গর্তে পড়ে একটা পেনি পেয়ে, ভাবলে বুঝি ধনী হলাম সকল ধনীর চেয়ে।' ছেলেরা মিস লট্টির চারধারে চেঁচাতে লাগল, নৃত্য শুরু করলে, 'বুড়ি ডাইনী' বলে লট্টিকে ডাকতে লাগল। মিস লট্টিও জোরে চেঁচাতে লাগল, আমাদের অভিশাপ দিলে। এই রকম অবস্থা অল্প সময়ই ছিল, চিৎকারে জন বার্কের টনক নড়ল, চেয়ারে বসে সে আমাদের দিকে তাকালে। মিস লট্টি আমার মাথা লক্ষ্য করে হাতের লাঠিটা ছুড়ল, আমরা ঝোপের আড়ালে চলে এলাম।

এরপর আমাদের উঠোনে ওক গাছের নিচে ওই ছোটর দল যখন হুল্লোড় করতে শুরু করলে আনন্দে, আমি তাতে যোগ দিই নি। হঠাৎ কেমন যেন লজ্জিত বোধ করলাম এবং যা করা হল—তা তো ছোটদের মজার ব্যাপারই, কিন্তু আমার মধ্যেকার নারীসত্তা আমাকে তিরস্কার করতে লাগল। বিকেল পর্যন্ত মনটা খারাপ হয়েই রইল। রাতে যখন ভাত খেলাম

চীনের তরকারি দিয়ে—বাবা যে চুপ করে গম্ভীর হয়ে আছে—তা লক্ষ্য করি নি ; কেন না বাবা আজকাল কিছুদিন ধরেই চুপ করে আছে। মা যে খাবার সময় ছিল না—তাও চোখে পড়ে নি। কারণ মাকেও আজকাল রাত অবধি কাজ করতে হয়। খাবার পর জোয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ বাজে তর্কাতর্কি হল, তারপর আমরা দু জনে আমাদের ঘরে শুয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, পাশের ঘরে মা ও বাবার গলা পাওয়া গেল। মা ফিরে এসেছে। কি যে বিষয় নিয়ে ওরা কথা বলছে প্রথমে তা মোটেই বুঝতে পারলাম না, শুধু গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল। মার গলাটা কেমন নরম ঠেকল—শান্ত, কোমল। আমি সেই স্বর শোনার জন্যে ব্যাকুল বোধ করলাম ; বাবার কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন কাটা কাটা, কেমন যেন অশান্ত।

'মেবেল, বাইশ বছর, এই বাইশ বছর ধরে আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারি নি, না কিছুই না !'—বাবা বলছিল।

'তাতে কি হয়েছে, চাকরি পেলেই তুমি করবে, এখন তো সবাই বেকার—তুমি তো জান !'

'না, না, এটা ঠিক নয়, পুরুষ মানুষ বসে-বসে বছরের পর বছর ধরে তার স্ত্রীর রোজগারে খাবে, চোখের সামনে দেখবে যে তাদের ছেলেমেয়েরা অভদ্র হয়ে যাচ্ছে ; এটা ঠিক নয়।'

'তুমি তো যথেষ্ট করেছ আমাদের জন্যে, যখন তোমার কাজ ছিল, এখন তো কারুরই কোনো কাজ নেই—'

'আমি অন্য কারুর কথা ভাবছি না, আমি নিজের কথাই বলছি, ঈশ্বর জানেন আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না।' মা কিছু যেন বললে, আমি শুনতে পেলাম না ; বাবা চিৎকার করেই ফের বললে—'তাহলে লোকে কি করবে বল ?'

'দেখ, আমরা তো না খেয়ে নেই, প্রতি সপ্তাহে তো টাকা পাচ্ছি, মিসেস এলিস সদয় আছে, জিনিসপত্তরও দেয়, এই তো শীতকালে মিস্টার এলিসের গরমের কোটটা পরার জন্যে তোমাকে দিয়ে দিলে।'

'চুলোয় যাক মিঃ এলিসের কোট, চুলোয় যাক তাদের টাকা ! তুমি কি ভাবো যে আমি সাদা আদমির টাকা চাই ? মেবেল—' এই কথার সঙ্গে বাবা ফোঁপাতে লাগল ; পরে কাঁদতে শুরু করলে, সেই কান্না যেমন নৈরাশ্য-মিশ্রিত, তেমনই যন্ত্রণাপীড়িত। অন্ধকার রাত্রে সেই কান্নার আওয়াজ শুনতে লাগলাম। এর আগে আমি আর কখনো কোনো পুরুষ মানুষের কান্না শুনি নি, ব্যাটাছেলে যে কখনো কাঁদে—তা আমি জানতাম না। দু-হাত দিয়ে আমি আমার কান চাপা দিলাম, তবু বাবার যন্ত্রণামুখর কান্নার শব্দ

কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। বাবা খুব শক্ত মানুষ, আমাদের কাঁধে নিয়েই রাস্তা চলে গান করতে-করতে, বাবা আমাদের জন্যে খেলনা বানিয়ে দিয়ে এমন হাসত যে আমাদের উঠোনের ওক গাছ পর্যন্ত সেই হাসির উত্তরে না হেসে পারত না। বাবা আমাদের মাছ ধরতে, খরগোশ শিকার করতে দেখাত। সেই মানুষটি এমন করে কাঁদছে! ভয় পাওয়া শিশুকে মা যেমন করে আদর করে তার ভয় ভাঙায়, মা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তেমনি করে।

জগতের চেহারা যেন বদলে গেল। আমার মা—যে নাকি কোমল, শান্ত মানুষ ছিল—সেই এখন পরিবারের স্তম্ভ, আর বাবা যে নাকি আমাদের পরিবারে পাহাড়ের মতো শক্ত ছিল, সে ছোট্ট শিশুর মতো কাঁদছে। ছিন্নতার বীণার মতোই সব কিছু যেন বেসুরো হয়ে উঠল। এই ছবিটা কোথায় ধরে রাখব? আমার সেদিনের সব কথা আজ আর তেমন করে স্মরণে জাগে না, শুধু কেমন আশ্চর্য রকম একটা ভয় জড়িয়ে থাকে!

অনেকক্ষণ পরে কান্না থেমেছিল। শক্ত করে হাত দুটো আমি কানেই দিয়ে রেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল বুঝি আমিই কেঁদে ফেলব, কেঁদে বুঝি বা সান্ত্বনা মিলবে। রাত্রি এখন নিস্তব্ধ, বাইরে শুধু ঝিঁঝিঁর শব্দ, আর ঘরের ভেতরে জোয়ের নিঃশ্বাসের আওয়াজ। ঘরটায় কেমন যেন ভয়ের পরিবেশ গড়ে উঠেছে, আমি ঘুমোতে পারব না; রাত্রি চারটে বেজেছে —এই রাত্রে একা জেগে থাকার সাহসও নেই, আমি ঠিক করলাম জোয়েকে ডাকব।

'আঃ, কি হয়েছে, কি চাও?' জোয়েকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে সে প্রশ্ন করলে।

'ওঠ, উঠে এসো।'

'কেন? কি জন্যে, যাও—'

মুহূর্তের জন্যে আমি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর ঠিক করতে পারলাম না, বলতে পারলাম না যে আমি ভয় পেয়েছি, একা থাকতে পারছি না; শুধু বললাম—'আমি বাইরে বেরোচ্ছি, তুই যদি যেতে চাস, ওঠ্, শীগ্গির।'

অ্যাডভেঞ্চার কিছু হতে পারে মনে করে তড়াক করে সে উঠে পড়ল; 'এখন বাইরে যাচ্ছ, কোথায়, এলিজাবেথ, কি জন্যে যাচ্ছ?'

মাথার উপর চাদর জড়াতে-জড়াতে বললাম—'আয়, আমার সঙ্গে।'

আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম, জোয়ে তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে পড়ল। 'দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ বল তো—এলিজাবেথ?'

আমি যেন দৌড়চ্ছিলাম, কে আমাকে তাড়া করছে যেন। অভিভূত হয়ে দৌড়তে-দৌড়তে দেখি মিস লট্টির বাড়ির দিকেই এসে পড়ছি।

প্রত্যুষের সামান্য আবছা আলো যেন রাতের অন্ধকারের চেয়েও অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর ঠেকল। সেই আলোয় পুরনো জীর্ণ বাড়িটা যেন পৃথিবীর শেষ ভগ্নদশা বলে মনে হল। ওটাকে ভূতের বাড়ি বলে মনে হল, আমার কোনো ভয় করছিল না, মনে হল আমাকেও ভূতে পেয়েছে।

জোয়ে বললে—'এলিজাবেথ, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে—'

সত্যি, আমার বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছিল, গ্রীষ্মকালীন যত অনুভূতি—সব কেমন জট পাকিয়ে গিয়েছিল, মায়ের জন্যে আমি কি কাজে লাগতে পারি—তাই মনে হচ্ছিল। আমাদের অপরীসীম দারিদ্র্য, বাবার কান্না,—সব মিলিয়ে একটা অসহায় বোধ পীড়িত করছিল! সেই মুহূর্তে আমি বালিকা না নারী—ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

'এলিজাবেথ!'

আমি এক লাফ দিয়ে গাঁদাফুলের বাগানে চলে এলাম, পাগলের মতো দু-হাতে ছিঁড়তে লাগলাম ফুলগুলি, ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলাম, দু-পা দিয়ে মাড়িয়ে চটকেও দিলাম। প্রত্যুষে শিশিরভেজা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারি হয়েছিল, আমি কোনো কিছু না দেখে শুধু ফুল ছিঁড়তে লাগলাম, কান্নায় আমার তখন গলা আটকে আসছিল।

জোয়ে আমাকে টেনে ধরলে, কোমর ধরে আটকে রাখার চেষ্টা করলে, বললে—'এলিজাবেথ, থামো, থামো।'

ছেঁড়া ফুল আর উপড়ে-ফেলা ফুলগাছগুলির স্তূপের উপর আমি তখন বসে পড়লাম। কি করেছি! এর তো আর উপায় নেই! আমি শুধু কাঁদতেই লাগলাম। জোয়ে ভীত হয়ে নীরবে আমার পাশে বসেছিল, কি যে সে বলবে—ভেবে পাচ্ছিল না। 'এলিজাবেথ, চেয়ে দেখ।'

কান্নায় ফোলা আমার চোখ-দুটো উপরে তুলে তাকাতেই দেখলাম—এক জোড়া সরু ক্লান্ত পা, একশো বছর বয়সের জীর্ণ এক দেহ, তুলোর তৈরি নৈশ্যপোশাক পরা, শক্ত অথচ বলিরেখাজর্জর চারদিক থেকে উড়ে আসা সাদা চুলে ঢাকা একটি মুখ। সেই মুখে কোনো ক্রোধের চিহ্ন নেই। বাগানটা তছনছ হয়ে গেছে, কোনো রকমেই আর এ উদ্যান পুনরুজ্জীবিত হবে না—

আমি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম—'মিস লট্টি!' সেই মুহূর্তে বুঝলাম শৈশব আমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছে, একটি নারী জাগছে আমার মধ্যে। সেই উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল পাগলামিই আমার শৈশবের শেষকৃত্য! সেই ডাইনী বুড়িকে আর ডাইনী মনে হল না, শুষ্ক, রুক্ষ, ধূসর, কুৎসিত পরিবেশে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ফসল বপনকারিণী এক বৃদ্ধা সাহসী মহিলা মনে হল। বিশ্রী জীর্ণ পরিবেশে সে জন্মেছে, সারাজীবন এমন বিশ্রী

আবহাওয়ায় কাটিয়েছে ! এই জীবনের শেষে এসেও সে এই জীর্ণ কুটীর, জরাপীড়িত দেহ এবং বুদ্ধিহীন জড়বুদ্ধি ছেলে জন *বার্ক ছাড়া আর কিছুই* পায় নি। তাঁর জীবনে যেটুকু শক্তি ছিল—তাই দিয়ে সে ওই গাঁদাফুল চাষ করেছে, সৌন্দর্যের পূজা করেছে, যত্ন দিয়ে, সোহাগ দিয়ে—সে শুধু ফুলকে ভালোবাসতে চেয়েছে !

মিস লট্টির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে আমি অবশ্য এ-সব কথা যে জানি—তা বলি নি। আমি বড় লজ্জিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল সময় যেন কথা বলতে চায়, যে ঘটনা ঘটল—সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে চায়। সেই লজ্জাজনক অপমানকর অবস্থায় আমি যেন মরমে মরে গেলাম, নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলাম না, যেন অন্য কে জেগে উঠছে আমার মধ্যে ! কার যেন করুণার অবলেপ পড়ছে আমার উপর !

বহু বছর চলে গেছে ; সময় আমাকে ঐ ঘটনা থেকে, ঐ জায়গা দূরে, বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছে, সেই ধুলি ধূসরিত জীর্ণতা এবং দারিদ্র্য-পীড়িত গ্লানি থেকে দূরে এনেছে সেই আশ্চর্য সুন্দর পরিবেশ—যা আমি উন্মত্তভাবে শিশুসুলভ ক্রোধে অন্ধ হয়ে নষ্ট করেছিলাম, সেখান থেকে সময় এখন আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে ! মিস লট্টি অনেক দিন হল মারা গেছে ; অনেক দিনও পার হয়ে গেছে—সর্বশেষ যখন তার সেই জীর্ণ কুঁড়ে আমি দেখে এসেছি, একেবারে শুকনো, ধূসর হয়ে রয়েছে জায়গাটা। আমার অবোধ, অবাধ্য বিবেকহীন আচরণের পর থেকে মিস লট্টি আর গাঁদা ফুলের চাষ করে নি, একটা গাছও আর বসায় নি। তবু, এখনো সময়-সময় সেই রৌদ্ররাঙা টাটকা হলদে সতেজ গাঁদাফুলের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে কি এক অসহ যন্ত্রণার সঙ্গে !

হ্যাঁ, আমি কিছু গাঁদাফুল গাছ লাগিয়েছি।

[Marigolds] অনুবাদ : শুদ্ধসত্ত্ব বসু

খাঁচায় বন্দী কালো পাখিটা

ক্যারোলিন রজার্স

এই মাত্র আমি একজন বৃদ্ধকে দেখলাম। লোকটি বোধহয় গুনে-গুনে পা ফেলছিল। একটু বাদেই বুঝতে পারলাম যে লোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময় সামনে থেকে একজন মহিলা ছুটে এসেই লোকটির হাতটাকে চেপে ধরল। মহিলাটি বেশ লম্বা আর বেশিমাত্রায় রোগা। তাঁর পরনে একটিমাত্র শেমিজ। মহিলাটি বৃদ্ধের কানে কানে কী যেন বলল। সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধটিও মাথা নাড়ল। মহিলাটি একরকম টানতে-টানতেই লোকটিকে রাস্তা পার করাচ্ছিল, আর সামনে চলমান গাড়িগুলোকে হাত-তুলে থামাতে চাইছিল। বুড়ো লোকটিও তাঁর ডোরাকাটা ফিকে লাল-সাদা রঙের লাঠিটা চক্রকারে ঘোরাচ্ছিল। আমি একটু ব্যবধান রেখেই ওদের অনুসরণ করছিলাম।

রাস্তার ওপারে গিয়ে মেয়েলোকটি বৃদ্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিস-ফিস করে কথা বলে। বৃদ্ধ লোকটি মাথা নাড়ে এবং একটু হাসবার চেষ্টা করে—বিবর্ণ জ্যাকেটের মধ্যে নিজের মুখটা লুকিয়ে নেয়। আমার সঙ্গে-সঙ্গে আর একজন মহিলাও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। প্রথম মহিলাটি আমাদের দু জনের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল এবং নিজের মাথাটাকে বেশ মজার ভঙ্গিতে উঁচু করে চলে গেল।

অন্ধ-বৃদ্ধলোকেরা যেমনভাবে লাঠি ঠুকে-ঠুকে পার হয় ঠিক সেইভাবেই লোকটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে লাঠি ঠুকছিল। ওর ঠোকার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যেন রাস্তার এপার থেকে ওপারে সাংকেতিক তারবার্তা পাঠিয়ে দিচ্ছে আর বার্তাগুলো ঠিক জাগায় পৌঁছে যাচ্ছে। লোকটি একবার এগোল, থামল আবার এগোতে লাগল। আমি দেখলাম কোণের ফ্ল্যাটবাড়িটার সামনে উঁচু জায়গাটায় তাকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে। মনে হয় কেউ ওকে

সাহায্য না করার জন্যেই এরকম ঘটনাটা ঘটল। আমি এখানে কিজন্যে দাঁড়িয়ে আছি জানি না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছি। আর একজন মহিলাও যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন, সন্তর্পণে লোকটির দিকে এগিয়ে এলেন, কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। এবং লোকটির হাত ধরে নিয়ে এগিয়ে চললেন। চলে যাবার সময় আমার মনে হয় ওরা যেন আমার দিকে প্রচণ্ড ঘৃণাভরা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হলাম। বাড়িতে ফেরার সময়ও লোকটির মুখখানা ভুলতে পারছিলাম না। দশবছর বাদে এই প্রথম আমার মনে পড়ল সাইমনের কথাটা।

সাইমনের চেহারাটা আগাপাশতলাই তেলতেলে। মুখখানা দেখে মনে হত যেন কোনো ভাস্কর তার দারুচিনি-রঙের মুখের প্রত্যেকটি রেখার উপর একটা ময়লা প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে। ওর তালিমারা স্যুটটাও সে-রকম দেখাত। তার প্রতিটি অঙ্গের ঢলঢলে পোষাক দেখে মনে হত যেন 'হ্যালোইন'-এর চারপাশে ঘুরে বেড়ানো এক কঙ্কালের ছবি।

রোজ ঠিক সন্ধ্যে ছটায় আমাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে সে দাঁড়াত। এমনভাবে শরীরটা নুইয়ে হেঁট হয়ে সে দাঁড়াত যে মনে হত যেন পিছন থেকে সে আচমকা কোনো আক্রমণের আশঙ্কা করছে। তার একটা হাতে নুড়িসমেত একটা তামার পাত্র থাকত। সেটাকে সে তার তৈলাক্ত রুমালটা দিয়ে ফিকে হয়ে আসা লাল-সাদা ছড়িটার সঙ্গে বেঁধে রাখত। আর একটি হাতে থাকত একটা মরচে-ধরা গরুর ঘণ্টা। ওটা দেখলেই আমি বাড়ির সব কাজকর্ম ফেলে ছুটে আসতাম। বেশিরভাগ সময়েই আমি একরকম হাঁপাতে-হাঁপাতে আসতাম আর ওকে মজা করে বলতাম, এই দ্যাখ আমি পালিয়ে আসছি। রোজ সন্ধ্যে ছ-টায় ওর আশায় বসে থাকতাম, যদিও আমার ভয় হত যে একদিন হয়তো ও আর আসবে না। এই দুবছর ধরে যখনই ও এসেছে জিজ্ঞেস করেছি, তুমি কেমন করে এলে ?

ও একবারও বলেনি কেমন করে এখানে এল। আমিও আর সেটা জানার জন্যে তেমন আগ্রহ দেখাই নি। কেবল বলতাম, আমি এসেছি।

ওর সাবধানী বুড়ো শিকারী-কুত্তাটা তখন কুঁই কুঁই করে এগিয়ে এসে আমার হাত চাটত। আমার মনে হত লোকটির কোঠরাগত পেঁচার মতো একজোড়া চোখ যেন আমাকে গিলে খাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এখন ভাবি যে তখন আমরা দুজনে মিলে সকলের কাছে কেমন উপভোগ্য হয়ে উঠতাম।

আমি তখন বেশ ছিপছিপে ছিলাম। আমার গায়ের রঙ বাদামী আর হাতপাগুলো এমন অস্বাভাবিক লম্বা ছিল যে আমার মনে হতো একমাত্র

লাফানো বা কাউকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া ওদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমার মাথার চুলও বেশ লম্বা ছিল। চুলের রঙ আর বুননটা ছিল অনেকটা শূয়োরের লোম দিয়ে তৈরি বুরুশের মতো।

জানলাভাঙা ঘিঞ্জি পুরোনো আসবাবপত্রের দোকানের ধার দিয়ে আমি লোকটিকে নিয়ে হেঁটে যেতাম। যাবার সময় দেখতাম একটি মাত্র ঘরওয়ালা গীর্জেতে তখন উপাসনার কাজ চলছে। একজন মেঝেয় শুয়ে চেঁচিয়ে মন্ত্রপাঠ করছে আর অন্যেরা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বোধহয় একটু হাওয়া পাবার জন্যে। ওদের দৃষ্টি বাইরের দিকে যেখান দিয়ে উদাসীন পাপিষ্ঠ লোকেরা মিছিল করে চলেছে। আস্তে আস্তে আমরা গীর্জেটি ছাড়িয়ে যেতাম। সামনেই সব ফরাসী-নামের সেলুন। কত রকমের নাম···। সেলুনগুলোকে দেখে মনে হত ভেতরে যেন গরমে ঝলসে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে অল্পপরিসর জায়গায় ঘর্মাক্তকলেবর নাপিতেরা নানারকমের আমেরিকান চুলের প্রসাধনী স্যাম্পু ক্রিম বা কলপ এমনভাবে সাজিয়ে রাখছেন যে ওখানে আর তিল ধারনের ঠাঁই নেই। দেখে মনে হয় যেন পৃথিবীর যাবতীয় পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য এখানে সাজানো রয়েছে। ক্রমশ আমরা সেলুনগুলো পার হয়ে এলাম। আশপাশের রেস্তোরাঁগুলোয় প্রচণ্ড ভীড় এবং রেকর্ডে নানারকমের বাদ্যযন্ত্র বিকটশব্দে বাজছে। এবারে আমরা এই চত্তরটিও পার হয়ে আসি।

চলতে চলতে অবশেষে আমরা একটা সরু গলির মুখে এসে দাঁড়াতাম। সেখানে এসেই সাইমন বিদায় নিত। আমি নিশ্চিত যে সে ওখানেই কোথাও থাকত। বাসী ময়লা-জমেথাকা, পেচ্ছাপে ভেসে-যাওয়া ঐ গলির ভেতরে অর্ধেকটাও কোনোদিন ওকে নিয়ে আমি ঢুকি নি। কয়েকমুহূর্ত ওকে আমি সেখানে দেখতাম, তারপর চাবুকখাওয়া ঘোড়ার মতো সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতাম। সাইমন তখনও সেই পূতিগন্ধময় গলিতে পিছনে পড়ে থাকত। বাড়িতে আমি একাই ফিরতাম। ওই স্মৃতিটুকুই ছিল আমার কাছে উঁচু-গোড়ালিওলা জুতো ও সিল্কের মোজার চাইতে মূল্যবান।

এই দশটা মিনিট হেঁটে ঘরে ফেরার পর নিজেকে কোনো স্বর্গীয় দেবদূতী বা লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থাক সাধুসন্তের মতো মনে হত। মনে পড়ে সাইমনকে আমি কখনও আমার পিছনে টেনে নিয়ে চলি নি বরং ওর সঙ্গে আস্তে আস্তে পথ হেঁটেছি। এসময় দুএকজন প্রতিবেশীর ছুঁড়েদেওয়া মন্তব্যও কানে এসেছে, 'ম্যাট্রি না, হ্যাঁ সেই অভিজাত মেয়েটা (আমি যে সবসময় প্যাণ্ট পরে থাকি সেটা ওরা ধর্তব্যেই আনতো না)।'

'দেখ দেখ মেয়েটি কেমন করে বুড়ো সাইমনকে নিয়ে হাঁটছে? মনে

হয় আমাদের বেট্রিও অনেকটা ঐরকম। ম্যাট্রিকে কক্ষনো ছেলেদের পিছনে ঘুরতে দেখবে না বা রাস্তায় জোরে কথা বলে লোকজনকে সচকিত করবে না। বাস্তবিক এমন মধুর দৃশ্য দেখা যায় না। নেলি আসছে বছরে আর কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করবে না, বিশেষ করে বাচ্চারা যখন ইস্কুলে যায়।'

আমি মনে মনে হাসি আসি আর ভাবি আমার মা-মণি কেমন করে এই সব মন্তব্যের জবাব দেবে!

'ম্যাট্রি এখন সত্যিকারের একটা খাঁটি বাচ্চা মেয়ে। এই জুনমাস এলে ওর বারোবছর পূর্ণ হবে। এখনও ওকে বাচ্চাই বলা চলে। আমি ওকে বলি যে মেয়েরা যখন এই বয়সে পা বাড়ায় তখন অন্যভাবে চলতে চাইবে। জোরে জোরে কথা বলবে না বা চুইনগাম চিবোবে না। বরং ঘরের অনেক বেশি কাজ করবে। তবে ও একটু কুড়ে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সেজন্যে ওকে নিয়ে আমার কোনো অসুবিধেই হয় না।'

আমি নিজের ভেতরে অন্যভাবে চলার কোনো লক্ষণ দেখতে পাই না। কোনোদিনও চুইনগাম খাই নি, বা জোরে জোরে কথাও বলি নি। বরং ঘরের কাজকম্ম আমি সব সময় কিছু না কিছু করি। বিশেষ করে মনে পড়ে মা যদ্দিন ধরে কাজ করে আসছে। এই ধরনের ভাবনা-চিন্তাও কখনও আমার মাথায় ঢোকেনি বা কোনো অপরাধবোধ আমার মনের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং যখনই সাইমনকে দেখেছি কেন জানিনা মেসেস পেট্রির কথাটা তখনই আমার মনে পড়েছে।

মিসেস পেট্রি থাকেন পাশের বাড়িতে। তাঁর বাতের রোগ। তাঁর পা-দুটোকে অনেকটা জোর করে বেঁকানো উইকোটের মতো দেখাত। ভদ্রমহিলা কখনও কোথাও যান নি। তাঁর স্বামীটিকে দেখেছি সবসময় মুখে চুরুট গুঁজে বসে থাকতে। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছি ওদের দুজনকে এই স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে বাস করতে আর মহিলাটিকে বাতের রোগে ভুগতে। লোকটি সব সময়ই তাঁর মুখের নিভে যাওয়া আধখানা চুরুট চিবোন আর তার রসটুকু পান করেন। আমার মনে হয় ওর মুখে ওই একটি মাত্র চুরুটই থাকত। কারণ আমি কখনও ওটাকে জ্বালাতে বা টানতে দেখি নি। সে যাই হোক, মা কিন্তু আমাকে মিসেস পোট্রির কাছে পাঠাতেন যাতে সেখানে বসে আমি তাঁকে দুদণ্ড বাইবেল পড়ে শোনাই। যখন আমার দোকানে যাবার মতো বয়েস হল তখন ওর জন্যে আমি অনেক খবর এনে দিতাম। উনি বেশ দয়ালু ছিলেন। আমার চুলে বিলি কেটে দিতেন। সে সময় আমার চুলগুলো খোঁচা হয়ে থাকত। উনি সেগুলি আঁচড়ে দিতেন আর বলতেন, আমার ছোট্ট মুখখানা বড় সুন্দর। মিসেস পেট্রির কাছে

জানতে পারি যে আমার এই রসাল দুখানা ঠোঁট আর আয়ত চক্ষু-দুটি একদিন আমার পরম সম্পদ হয়ে উঠবে।

আমি ওঁদের ভেঙে-পড়া কুশনটার ওপর চুপচাপ বসে থাকতাম। সে সময় উনিও ওঁর চশমাটি নাকের ডগায় রেখে প্রায়ই গীর্জের ভজন কিংবা ক্লিওল-এর নিজস্ব ভাষায় কথা বলতেন, 'ওগো প্রিয় তোমার ওই সুন্দর মসৃণ মুখে কখনও পাউডার লাগিও না।' ওঁর কথায় আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি নি। কারণ উনি যেসব প্রশস্তি করতেন সেগুলো আমার কাছে চকোলেটের মতো মিষ্টি মনে হত। চকলেট খাবার পর যেমন তার মিষ্টি গন্ধ অনেকক্ষণ মুখে লেগে থাকে ঠিক তেমনি। বাড়ির লোকেরা এক সময় আমাকে ঠাট্টা করে বলত যে আমি যা খাই তা হজম করতে করতেই রোগা হয়ে যাই। যাই হোক যত দিন যায় আমিও তত অস্থির হয়ে উঠি, কারণ সবসময় নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। সময় সময় মিসেস পেট্রির সঙ্গেও আমার খুব কম কথাবার্তা হয়। মিসেস্ পেট্রি প্রতি শনিবার আমাকে মুদির দোকানে পাঠান আর আমিও তাঁর সপ্তাহের কেনাকাটা করে আনি। মাসখানেক যাবার পর বুঝতে পারি যে মিঃ পেট্রি কখনও ওধার মাড়ান না বা এখান থেকে মুদির দোকানও দেখা যায় না। এ বাড়িতে কোনোদিন খবরের কাগজ আসেনি। মিসেস পেট্রিও নিশ্চয় এসব জিনিসের দাম জানেন না, সেজন্যে আমি ওঁদের ঠকানোর রাস্তা ধরি। প্রথমে এক-আধ পয়সা, পরে প্রায় সিকিভাগ এবং শেষপর্যন্ত দু-তিন ডলার একসঙ্গেই হাতিয়ে নিতাম। অবশ্যি দোকানে যাবার জন্যে ওঁরা আমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতেন। তবু শনিবার সকালে কেনাকাটার জন্যে মুদির দোকানে দাঁড়ানোর পক্ষে মাত্র ওই কুড়িটা সেণ্ট যথেষ্ট ছিল না বিশেষ করে ঐ ভীড়ে, কোলে কাঁখে বাচ্ছা নিয়ে জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ, ঠেলাগাড়ি, আর চড়া মেজাজের খাদ্য-তদারককারীদের সঙ্গে যখন গুঁতোগুঁতি করে দাঁড়াতে হত। আমি সব সময় নিজেকে অপরাধী ভাবতাম ঠিকই তবে এই অভ্যেসটা ছাড়ার কথা অতোটা ভাবি নি।

আমাদের সংসারে উপরি কোনো অর্থের সংস্থান ছিল না। দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকু মেটানোর মতো বাবা সামান্য রোজগার করতেন। শুনেছি আগে নাকি তিনি দুটো কাজ করতেন। তবে জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে দেখেছি, যখনই তিনি বাড়িতে থাকেন কেবল ঘুমোন। তাঁর কাছে পয়সাকড়িও থাকত না, অন্তত তাঁকে তাই বলতে শুনেছি। মা ছিলেন অন্য ধাতের। একটু কিপটে, সবকিছুই জমানো তাঁর স্বভাব, তাঁর কাছে কিছু চাওয়াও অর্থহীন। কারণ যা চাইব তার প্রয়োজনটাই আগে প্রমাণ করতে হবে। অবশ্যি আমি তাঁকে বেশ সহজেই বাগে আনতে পেরেছিলাম।

আমি এমনিতেই বেশ স্মার্ট ছিলাম। জমকালো কোনো কিছু পরা বা বেশি পয়সা খরচ করে রেকর্ড, বই বা পাজলস্ কেনার আগ্রহ আমার ছিল না, যদিও ওগুলি আমি পছন্দ করতাম। সোডা আর পানীয়-র জন্যে তখন আমি প্রচুর খরচ করতাম। তবে আশ্চর্যের বিষয় যে আমার দেহের মাপে বা গায়ের চামড়ায় তার কোনো ছাপ পড়েনি।

মিসেস পেট্রি প্রায়শই বলতেন, পাড়ায় উইলিয়ম-পরিবারের মেয়েরা বেশ সভ্যভব্য আর বিশ্বাসী। পুজোআর্চা করতে ভালোবাসে। আমি কিন্তু গীর্জে-যাওয়াটা একদম পছন্দ করতুম না। অন্য কোথাও বিশেষ যেতাম না। কারণ মায়ের বারণ ছিল। বাইরে যখন খেলতে যেতুম রাস্তা পার হতুম না। বেট্রি এবং জয়েসকে ঠিক মহিলা বলা চলে না। ওদের দেখে ছেলেরা রাস্তায় পয়সা ছোড়াছুড়ি করত। আমার নিজের কোনো সাইকেল ছিল না। তাছাড়া অন্যসব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেও আমার ভালো লাগত না। মা প্রায়ই বলতেন যে আমি ন্যাটা বলে আমার কাছে শয়তানের পুরো একদিনের কাজ পাওনা হয়। অন্যকাজে প্রয়োজন না হ'লে যদিও সে তার কোনো হিসেব রাখে না। অতএব সময় কাটাবার জন্যে আমাকে গীর্জেয় যেতে হত। এক হিসেবে শয়তানকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে আমি বেশ একটা মুক্তির স্বাদ পেতাম।

রোববার সকাল সাড়ে-আটটার সময় গীর্জেয় যাই। এগারোটার প্রার্থনায় এরকম টলতে টলতে সেখানে যাই, আবার যেতে হয় সন্ধেবেলার প্রার্থনায়। মঙ্গল, বেস্পতি ও শুক্রবারে বি. টি. উ-তে যাই। বি. টি. উ হল ব্যাপটিস্ট ট্রেনিং ইউনিয়ন, যেখানে খ্রিস্টান যুবকরা মুক্তির আশায় গিয়ে থাকে। মা বলতেন যে রেভারেণ্ড মেটকাফ্ নিশ্চিতভাবে আমার মনে সবরকমের পবিত্র চিন্তা এনে দেবে। তিনি খানিকটা ঠিকই বলতেন। সত্যিই রেভারেণ্ড মেটকাফ্ আমার ভেতরে অনেক চিন্তা ঢুকিয়েছিলেন। মঞ্চের ওপরে তিনি পদচারণা করতেন আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে পা ঠুকতেন। তাঁর আহ্বান ছিল সমস্ত পাপীর প্রতি। তারা যেন গিয়ে তাঁর কাছে কৃতকর্মের জন্যে অনুশোচনা করে। যদিও আমি জানি, একমাত্র পুরোনো চার্চের তত্ত্বাবধায়কেরা ছাড়া এই বি. টি. ইউ-র প্রত্যেককেই তাদের বাপ-মা এখানে পাঠিয়েছেন। তাঁরা সত্যি সত্যিই তাদের আত্মার মুক্তি চায়, যাতে সত্যিই মরে যাবার পর স্বর্গে গিয়ে যীশুর সঙ্গে মিলতে পারবে আর চিরকালই মধু মেশানো দুধ খেয়ে থাকতে পারবে।

সন্ধ্যে সাড়ে-আটটা বাজলেই আর রোববার সন্ধ্যে হলেই রেভারেণ্ড মেটকাফ্ তাঁর গীর্জের দরজা খুলতেন এবং এগিয়ে এসে বেশ মধুরভাবে

পাপী-তাপিদের উদ্দেশ্যে বলতেন যে তারাও যেন এগিয়ে এসে তাদের পাপ স্বীকার করে আর তার জন্যে অনুতপ্ত হয়। তিনি জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলতেন, 'তোমরা জানো, তোমরা কে! যীশুও জানেন তোমরা কে! এ নিয়ে আর তোমাদের হৃদয়কে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করো না। তোমাদের ভার যীশুকেই বহন করতে দাও। অনুতাপ কর, অনুশোচনা কর—সত্যিই প্রভু তোমাদের হৃদয়কে জানেন।'

যদিও তিনি ঐ একটি কথাই বার বার বলতেন তাহলেও তাঁর কথার ঠিক ঐখানটাতেই আমার গণ্ডদেশ বেয়ে চোখের ধারা নামত। তখন যেন মনে হত আমার প্রচণ্ড শীতবোধ হচ্ছে বা কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে। স্টুয়ার্ট-পত্নী সমবেত লোকজনের সামনে অস্থির ভাবে ঘোরাফেরা করতেন। তাঁর পোষাক ছিল নার্সদের ইউনিফরমের মতো। অবশ্য স্টুয়ার্ট-পত্নীদের পোশাক-আশাকের ধরনটাই ছিল ঐ রকমের। যাই হোক, মাথাটাকে খাড়া রেখে শরীরটা একটু নুইয়ে, হাতদুটো বুকের মধ্যিখানে রেখে তিনি বলতেন, 'এই যে—এই যে'···আর বলতে বলতে ছুটে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে চাপড়ে দিতেন। একমাত্র আমার মা আর অন্য ভাইয়েরা ছাড়া সকলেই হয়ত মনে করত যে সত্যিই আমি প্রভুর অনুকম্পায় আপ্লুত হয়েছি। স্টুয়ার্ট-পত্নী বেসী আমাকে এই বলে আশ্বাস দিতেন যে প্রভু সত্যি-সত্যিই জানতে পেরেছেন আমার মনের কথা। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আমার আরও বেশি কান্না পেত। কারণ এর অর্থ হল আমি যে কুচিন্তা করছি, বিশেষ করে মিসেস পেট্রির ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী মনে করছি, সেটাও নিশ্চয় উনি জানতে পেরেছেন।

এখন ব্যাপারটা নিয়ে যখন ভাবি তখন মনে হয় আমার ধারণাটা সঠিকই ছিল। আমি ছেলেদের সম্পর্কে কখনও চিন্তা করি নি। যখন করলাম তখন সে মাত্র একজনকে নিয়েই। শুধুমাত্র ছেলেদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতাম, দড়ি লাফাতাম আর সাইকেল চড়তাম। অথবা রাস্তা পার হয়ে ঐসব 'খারাপ' ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু খেলা করতে চাইতাম। কিন্তু মিসেস পেট্রি আর সাইমন ছিল আমার খেলার সঙ্গী।

এখন দশবছর বাদে আমার সেই অপরাধ-বোধ আবার জেগে উঠেছে, তাও আবার এমন একজন বৃদ্ধ লোককে নিয়ে যাকে আমি চিনি না। ভাবছি সাইমনের কথা আর অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে মিসেস পেট্রি কী বলতেন যদি তিনি আমাকে এই ছাঁটা চুল, সামান্য পাউডারের প্রসাধনে বিন্যস্ত মুখ, রঙ-লাগানো ঠোঁট এবং হাঁটুর ওপরে ওঠা খাটো জামাপরা অবস্থায় দেখতেন। যখন পরিচ্ছন্ন অঞ্চলের এই নতুন বাড়িতে আমরা উঠে এলাম

তখন আমার বয়েস মাত্র পনেরো। আর কখনও সেখানে ফিরে যাই নি, একবারও না! সত্যি ভেবে অবাক হচ্ছি যে এখনও এ-নিয়ে আমার মনে এরকম বিস্ময়ের পুলক জেগে ওঠে কেন? সত্যি, আমার কী হয়েছে! কেন আমি ওখানে ঐভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আর বোকার মতো লোকটাকে প্রাণপনে রাস্তা পার হবার জন্যে চেষ্টা করতে দেখেছিলাম। যখন দেখলাম তখন ওকে সাহায্য করলাম না কেন?

কিন্তু পৃথিবীতে তো হাজার হাজার অন্ধ লোক রয়েছে আর তাদের প্রত্যেকের পেছনে অন্তত দশজন করে লোক রয়েছে যারা চক্ষুস্মান এবং তাদের সাহায্য করতে পারে। আমি কেন তাদের একজন হলাম? ঠিক আছে, আরও ন'জন তো রয়েছে? তারা করুক। আমি কখনও বুঝতে পারি নি কেন আমি পাঁচটা বড়ো রাস্তা পার হয়ে সাইমনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম আর মিসেস পেট্রির জন্যে মুদির দোকান থেকে জিনিস কিনতে গিয়ে দু' দুটো বড়ো রাস্তা পার হয়েছি! অথচ একটা ছোট্ট রাস্তা পার হয়ে গিয়ে পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনই খেলতে পারি নি।

মা বলছিলেন, এটা একটা আলাদা ব্যাপার! সত্যিই তাই!

[Blackbird in a Cage] অনুবাদ : মুকুল রায়

লাইব্রেরি

নিক্কী গিয়োভানি

ব্যাপারটা কী তা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি এ নিয়ে তেমন কিছু চিন্তাও করি নি। আমরা কীভাবে চলব সেটা আমরা নিজেরাই জানি—লোককে উত্যক্ত করা বা এইসব নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে শুধু শুধু কষ্ট পাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। ছোটবেলায় দেখেছি, কেউই কালোদের সৌন্দর্য, শক্তি বা সম্ভাবনা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না। এমন কি, সাদাচেহারার মানুষদের ক্ষমতা সম্পর্কেও তেমন সচেতন ছিল না অনেকেই। সচেতন ছিল না তাদের ভুল, পীড়ন-পদ্ধতি, তাদের প্রচণ্ড অত্যাচার সম্বন্ধে—যার জন্যে আমার বাবাকে হারাতে হল দূরে অজ্ঞাত যুদ্ধক্ষেত্রে, তার বদলে সদাশয় মার্কিন সরকার দু হাজার ডলারের নোট দিলেন বটে, কিন্তু আমার বাবা তো আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। আমাদের সঙ্গে বাবার সেই দেখা, অথবা মায়ের সঙ্গে খুনসুটি-দিনগুলো চিরকালের মতো চলে গেল।

ছোটবেলায় আমরা নিজেদের নিয়ে খুব অসুখী ছিলাম। সেই অসুখ অন্যের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করা হত, কারণ আমেরিকা হচ্ছে বীরদের দেশ, আর আমরা তাদের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম। তাই, শুধু 'ভ্রাতৃত্বসপ্তাহ' বা 'নিগ্রো-ইতিহাস-সপ্তাহ'র মতো কয়েক দিন ছাড়া কখনোই কেউ আমাদের গ্লানিময় অতীত সম্পর্কে আলোচনা করি নি। প্রবাসে থাকার সময় আমরা 'দাসত্বমুক্তির' উৎসব পালন করতাম। সেদিন সাদারা আমাদের ওয়াইটওয়াশ পার্কে আনন্দানুষ্ঠানের জন্য যেতে দিত।

মা আর বার্থা-কাকীমাকে আমি বলতে শুনেছি যে নিগ্রোরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই জানে না। আমি অবশ্য সেই অর্থে পুরোপুরি অজ্ঞান ছিলাম না। কারণ অন্ততঃ একটা জানার মতো ব্যাপার আমি জানতাম বলে

মনে হয়, আর সেটা হল আমি কিছুই জানি না। একবার সত্যি সত্যি খুব একটি 'উজ্জ্বল যুগে' (এই নামেই একে অভিহিত করা হয়), এই টি-পট কেলেঙ্কারীর সময়ে এণ্ড্রু কার্ণেগী বলে এক ভদ্রলোক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক অর্থ দান করেছিলেন। এই ভদ্রলোক একসময়ে লেখাপড়া জানতেন না, সে সুযোগ তিনি পান নি, তাঁর ইচ্ছা ছিল সেই সুযোগ সকলেই যাতে পায়। আমাদের দেশে কার্ণেগীর লাইব্রেরি শুধুমাত্র কালোদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল। নিগ্রোদের সম্পর্কে জানার জন্যে মাকে আমি প্রায়ই বিরক্ত করতাম। তাই মা একদিন আমাকে সেই লাইব্রেরিতে নিয়ে গেলেন। গ্রন্থাগারিকা প্রথমেই বকারটি ওয়াশিংটন বলে এক বিখ্যাত লেখকের 'দাসত্ব থেকে মুক্ত' বইটা আমাকে পড়তে দিলেন। এই লেখক প্রায় নিঃস্ব অবস্থা থেকে নিজেকে সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রধানতম-নিগ্রোদের মধ্যে একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজনীতি বা ঐ জাতীয় জিনিস নিয়ে আমরা যেন মাথা না ঘামাই। অর্থাৎ, আমার মতে বুটিগুলিকে ভাসিয়ে রাখ' অর্থাৎ, আমারা যেখানে রয়েছি সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। দক্ষিণাংশের মানুষেরা আমাদের ওপরে ভালো ব্যবহার করবেন, তাই আমরা আশা করি। সেই সঙ্গে তাঁরা যেন মনে করেন আমরা তাদের সন্তানতুল্য।

এই ডঃ ওয়াশিংটনের লেখা মা খুব পছন্দ করতেন। সত্যি বলতে কি, যথার্থ অনুগামিনী বলতে যা বোঝায়, মা ছিলেন তাই এই লেখকের। মা সারাদিনে দু-দুটো চাকরি করতেন, এমন কি রবিবারেও অর্ধেক দিন তাঁর ছুটি ছিল না। ডঃ ওয়াশিংটনের মত হচ্ছে যদি কেউ কঠোর পরিশ্রম করে এবং কাউকে দুঃখ না দেয়, তাহলে জীবনে সে শান্তি আর নিরাপত্তার আস্বাদ পাবেই। তাঁর এইসব বাণী আর জর্জিয়ার আটালান্টাতে এর উপর তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি পড়ে আমি না হেসে পারি নি। আমি তো জানতাম আমার মা সারাদিন কী কঠোর পরিশ্রম করেন, কই কই, আমাদের ঐশ্বর্যই বলো আর সুখ শান্তিই বলো, কোনটাই তো ছিল না। আমরা কখনো অন্যের মনে দুঃখ দিতে চাই নি। মা অবশ্য বলতেন যে সাধারণ লোক স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণমনা, আর কিছু লোক থাকবেই যারা আরো বেশি—যাকে বলে নীচ। তাই, আমরা যত কঠোর পরিশ্রমই করি না কেন তার কোনো দাম ছিল না। আর ছিল না বলেই কোনোদিনই আমরা কোনো শান্তি পাই নি।

আমি লাইব্রেরিতে ফিরে গিয়ে সেই মহিলাকে বললাম, বইটা আমার মোটেই পছন্দ হয় নি, কারণ এতে যা লেখা রয়েছে তা সব সত্যি নয়।

যদি এর সব কথাই সত্যি হত, তবে আরো অনেক বেশি সুখশান্তি আমাদের প্রাপ্য ছিল বলে আমরা মনে করি। আমার মা বাবা ঠাম্মা বা ঠাকুর্দারা কেউ কারো সাতে-পাঁচে থাকতেন না। ডেকন রাইট যখন গীর্জার টাকা চুরি করেছিল সেই একবারই কেবল তাঁরা বাইরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে ছিলেন। একথা কখনোই বলা যাবে না যে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের এই বিশ্বাসঘাতকতায় হতাশ হয়ে আমরা কোনো ভুল করেছিলাম। আমার মনে হয় এই বিশ্বাসঘাতকতা আসলে মানুষের বিরুদ্ধেই। যে অধিকার কোনো দিনই আমরা ভোগ করতে পারি নি সেই অধিকার অর্জনের জন্যে বাবা যেদিন হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছিলেন সেই বাবার সম্পর্কে মাকে আমি বলতে শুনেছি যে যুদ্ধ ব্যাপারটাই জঘন্য। এই কুৎসিত ঘটনা যথার্থ যদি কোনো সুফল এনে না দেয়, তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধকে পরিহার করা উচিত। এইসব ভেবে আমি ডঃ ডুবয়েস বলে একজন লেখক, যিনি অত্যন্ত সপ্রতিভ লেখনীর অধিকারী—তাঁর বই নিলাম।

তাঁর মতে, মনুষ্যত্বের অধিকার অর্জনের জন্যে সংগ্রাম করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য। রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার, এবং আমদের আদিভূমি আফ্রিকা সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এইগুলোই হচ্ছে আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি বলেছেন, ডঃ ওয়াশিংটন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছেন। এখন অন্য নিগ্রোদেরও এই ক্ষমতা না দেওয়া তাঁর পক্ষে খুবই স্বার্থপরতা হবে। ডঃ ডুবয়েস কালো মানুষদের উন্নতির জন্যে একটা জাতীয় সমিতি গঠন করেছিলেন। শ্বেত-প্রভুরা তাতে তাঁর উপর ক্ষেপে ওঠে, ফলে তিনি বাড়ি ছেড়ে আফ্রিকায় গিয়ে বাস করেন। তাঁর লেখা আমি খুবই পছন্দ করতাম। কিন্তু তবু আমাদের বিপদ ছিল অনেক। কারণ, আমরাও যে মানুষ, সেটাই আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলি, তখনই তো তা বোঝা যায়, আবার আলাদা করে একথা প্রমাণ করবার দরকার কী? তার ওপর, তারা এমন সব আইন করেছে যে মানুষের ন্যূনতম অধিকার থেকেও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। ডঃ ফ্রেডরিক ডগলাস বলেন, আমরা যদি মানুষই না হব, তাহলে এইসব আইনের কী দরকার ছিল। ধর কালোদের সঙ্গে শ্বেতকায়দের বিবাহ নিষিদ্ধ করে যে আইন—তাই তো প্রমাণ করে দেয় আমাদের মনুষ্যত্ব। একটা ষাঁড়ের সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ করে কি কোনো আইন হতে পারে? পারে না, কারণ ষাঁড়ের সঙ্গে কোনো শ্বেতকায়ের বিয়ে সাধারণভাবেই অসম্ভব—তার জন্যে আলাদা

করে কোনো আইনের দরকার হয় না। তাই আমার তো মনে হয় শুধু ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস, চার্চে যাওয়া বা পরিবার গঠনের অধিকারকেই সাম্য বলা যাবে না।

সেই জন্যে আমি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে আরো বেশি করে জানার জন্যে লাইব্রেরিয়ানের শরণাপন্ন হলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যাপারে যথার্থ মতটা কী ব'লে তাঁর মনে হয়। তিনি তাই শুনে খুব কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর আবার খানিক কটমট করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিড়বিড় করে বললেন, 'এঃ, আমি কী বুদ্ধু রে!' তারপর আমাকে একেবারে লাইব্রেরি বন্ধ হবার সময় আসতে বললেন। আমি অগত্যা 'ড্রাগ-সেন্টারে' গিয়ে সস্তা পত্রিকার পাতা উলটে সময় কাটাতে লাগলাম। লাইব্রেরিতে ফিরে যেতে ভদ্রমহিলা চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলেন,' তোমাকে এখানে আসতে কেউ দেখেনি তো!' আমি না বলতে তিনি লাইব্রেরি বন্ধ করে চারদিকটা বেশ ভালো করে দেখে নিলেন। তারপর বললেন, 'শপথ কর, তোমাকে আজ যা দেখাব, তা তুমি কাউকে বলবে না!' আমিও যথাবিধি পূর্বদিকে তিনবার ক্রশ করে শপথ করলাম। এইবার তিনি আমায় নিয়ে মাটির নিচে নামতে লাগলেন। এই জায়গাটায় 'মাতৃ সমিতির' অধিবেশন বসে থাকে। তাঁর হাতের জোরালো আলোয় সবকিছু স্পষ্ট। ডানদিকে টেলিভিশনের পাশে একটা দরজা। দেওয়াল থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে তিনি আর আমি ভেতরে ঢুকলাম। তিনি বললেন যে এটা আসলে পাতাল রেলের একটা অংশ—এখন অবশ্য ব্যবহার হয় না। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রায় মিনিট পাঁচেকের মতো হাঁটতে হয়। সত্যি বলতে কি, তখন আমার গা বেশ ছমছম করছে।

আর একটা দরজার সামনে আসতে তিনি ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আবার বললেন, 'প্রতিজ্ঞা কর, আজ তোমায় যা দেখাব, তা তুমি কাউকে বলবে না।' আমি আমাব গ্রেস-দাদুর বাইবেল হাতে শপথ করলাম। তখন তিনি সেই অদ্ভুত মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন,

'ওলে নাট টার্ণার এখনো বেঁচে
একটা তাকে দিলে আরো পাঁচখানা সে চায়
ডেনমার্ক ভেসলে চটপটে বসে
একশ'খানা দিলে তাকে দেড়শখানা চায়
গ্যাব্রিয়েল গ্যাব্রিয়েল তোমাকেই তো চাই
তুমি যদি না পার তো গারভের কাছে যাই।'

এই মন্ত্র বলবার সময় থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। ক্রমশঃ তাঁর চুল এলোমেলো হয়ে গেল, সমস্ত প্রসাধন যেন গলে গলে বেরিয়ে এল, তাঁর মুখ, পা-পর্যন্ত লম্বা মোটা কাপড়ের আলখাল্লা তাঁর পরণে, পায়ে আর জুতো নেই। তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো আফ্রিকান আদিবাসিনীর মতো। যদিও, যে-সব বই দেখাতে উনি আমায় এখানে এনেছেন সেগুলো পড়বার আমার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে আমি খুব বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। টেনে দৌড় মারাটাই বোধহয় ঠিক হবে—এইরকম যখন ভাবছি সেই মুহূর্তেই দরজা খুলে গেল, আর ভদ্রমহিলা আমাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

বিশাল একটা ঘর, জাদুঘরের মতো বড়, আমার হাত যায় এতদূর পর্যন্ত বইয়ে ঠাসা। তিনি বললেন যে, এই হ'ল সেই 'ব্ল্যাক মিউজিয়াম'—এখানেই সেই মহান 'ব্ল্যাক বুক' রয়েছে। এর বেশির ভাগ বই সম্পর্কেই লোকে কিছু জানে না। যতদিন পর্যন্ত না লোকে পুরোপুরি তৈরি হচ্ছে, এ বইগুলো প্রকাশিত হ'বে না। কিছু কিছু বই যে মাঝে মধ্যে বাইরে বেরিয়ে যায়নি তা নয়, কিন্তু সাদারা সে-সব বই নষ্ট করবার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লাগল, আর তাই বইগুলো যেন তাদের নিজস্ব অনুভবেই তাদের এই বাড়িতে ফিরে এল, আমাদের ঠিক ঠিক তৈরি হবার অপেক্ষায়। লাইব্রেরিয়ান আমার আগে আর একজনকেই এই সংগ্রহ দেখিয়েছিলেন। লোকটাকে সবাই 'পাগলা বুচ' বলে ডাকে। সে কেবলই আপনমনে বিড়বিড় করে, আর লোকে তার কোনো কথাই বুঝতে পারে না।

আমার গা গোলাচ্ছিল। সেখানে আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন—সব জায়গা সম্পর্কেই বই ছিল। সাজানো ছিল রোনাল্ড ফেয়ার, জন কীলেন্স, লিরোন বেনেট এবং লিরেইজনসের লেখা। তাছাড়া এড বুলিন্স, ল্যারি নীল, ইথারিজ নাইট, ডায়ান ওলিভার—আরো রাশি রাশি লেখকের বই সেখানে। বড় বড় ম্যাপওয়ালা-ছবির বইয়ের সঙ্গে চুপচাপ বসে আছে শুধু লেখাভর্তি ছবি-ছাড়া বইপত্তর। কোন্ বিষয়ের ওপর বই নেই? বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বড়দের বই, এমন কি আমাদের পছন্দসই সব রান্নার বিষয়ে বই দেখলাম সেখানে। আর, সর্বোপরি, আমার চেয়ে লম্বায় বড়, দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা সেই বিখ্যাত 'ব্ল্যাক বুক'। অনুমতি নিয়ে জামায় হাত মুছে আমি পাতা ওলটালাম। ঠিক আমার জন্মসালের বছরের পাতাটা খুলে গেল। সেই বছরের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা সেখানে লেখা আছে। স্বভাবতঃই আমার নিজের সম্পর্কে এতে কিছু লেখা নেই, তবু আমার খুব ভালো লাগছিল। আরো দশ বছর পার হয়ে এসে আমি তখন

কি কি ঘটেছিল দেখতে পেলাম। ভবিষ্যতের ঘটনা জানবার জন্যে পাতা ওলটাতেই কিন্তু লাইব্রেরিয়ান আমাকে থামিয়ে দিলেন। এই বইয়ে লেখা ভবিষ্যতের বর্ণনা যে পড়বে, তৎক্ষণাৎ তার বয়োবৃদ্ধি থেমে যাবে! মানে, দশবছর বয়সে এই ভবিষ্যদ্বাণী পড়লে বাহ্যতঃ সে সেই দশবছর বয়সেই থেকে যাবে যদিও পরবর্তী শতাব্দীর কথাও তার অবিদিত থাকবে না।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে 'পাগলা বুচের' নামটা ঝলক দিয়ে গেল। এত দিনে আমি বুঝলাম তার ব্যাপারটা আসলে কী। সে সব কিছু বোঝে, যদিও আর কেউ তাকে বুঝতে পারে না। আমি জানি, কোনো মানুষের এই দুর্বোধ্যতার ফলে কী করে লোকে ধারণা করে নেয়, অতিরিক্ত পড়াশোনাই তাকে অপ্রকৃতিস্থ করেছে।

তবু আমি জানবই, কারণ আমার মতে মানুষ যতখানি পারে ততখানি তার জেনে নেওয়া উচিত। আর তাছাড়া ভবিষ্যতের যে দিনটি পর্যন্ত তোমার জ্ঞান, সেই দিনটি আসা মাত্রই তুমি আবার বাহ্যতঃ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, আর তখন লোকেও তোমায় নিয়ে হাসিঠাট্টা করা ছেড়ে দেবে। তাই আমি তো একেবারে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পড়ে ফেললাম। উরিব্বাস! শোন এবার কি কাণ্ডটা হবে! আমি ফ্রয়েড মিকিসিক, সেই ছোট্ট ছেলে স্টকলি কারমাইকেল, অথবা ব্ল্যাক সাইনিং প্রিন্স, আর র‍্যাপ ব্রাউন কিভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবেন তাই পড়লাম। এছাড়া, ভিয়েৎনামের জনগণ, আমেরিকার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের ইতিবৃত্ত জানলাম, কিংবা সেই পুতুল-রাজা থমবের কথা। আমেরিকার পঁয়ত্রিশ নম্বর রাষ্ট্রপতি নিকসনের সম্পর্কে মজার মজার গল্প, আর কি করে ফোর্ড ছত্রিশ নম্বর রাষ্ট্রপতি হলেন—সে সবও অজানা রইল না।

কিন্তু থাক, এইবার বিদায়ের সময় হ'ল। আমি আবার সেই পুরনো সার্কাসের খাঁচার জীবনে ফিরে গেছি। এই জীবন—খুব মন্দ নয়, তবু মনে হয়, এই বদ্ধ খাঁচায় অনর্থক বেঁচে থাকার থেকে যদি মাঝে মাঝে মুক্তি পাওয়া যেত।

[The Library]

অনুবাদ : সৌমিত্র বসু

লেখক পরিচিতি

॥ আফ্রিকা ॥

অ্যালেক্স্ লা গুমা (Alex la Guma)—জন্ম কেপটাউনে ১৯২৫ সালে। কেপটাউন শহরটি বর্ণবিদ্বেষের পীঠস্থান। নিগ্রো মেহনতী মানুষের বংশে জন্ম। অল্প বয়সেই এঁর মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। রাজনীতিতেও এঁর বেশ আগ্রহ ছিল। মেজাজের দিক থেকে ইনি বেশ উগ্রপন্থী। অনেক বিপদ-আপদের বিরুদ্ধেই এঁকে সংগ্রাম করতে হয়। এই অবস্থাতেও ইনি সৃজনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সাম্প্রতিক বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিজের জাতিকে রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে ইনি নিজের জীবনকে সাহিত্যে উৎসর্গ করেছেন। বর্তমানে ইনি Afro-Asian Writers' Association-এর মহাসচিব।

আল্ফ্ ওয়ানেন বার্গ (Alf Wannenburgh)—১৯৩৬ সালে কেপটাউনে জন্ম। ম্যাট্রিকিউলেশন পাশ করার পরে ছোট-ছোট নানা রকম কাজ করেন। প্রবন্ধরচনার মাধ্যমে সাহিত্য-জীবন শুরু। পরে শুরু করেন গল্প লিখতে।

ইজিকিয়েল মাহাফেল (Ezekiel Mphahlele)—দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বস্তিতে ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে জন্ম। জোহানেস্‌বার্গের একটি বেশ বড় বিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে এঁর চাকরি যায়। ১৯৫৭ সালে নাইজেরিয়াতে চলে এসে সেখানে শিক্ষকতা করেন। 'African Programme for the Congress for Cultural Freedom'-এর অধ্যক্ষ হিসাবে প্যারিসে কাজ করেন। বর্তমানে নাইরোবির বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ দুটি—'Man must Live' এবং 'The Living and the Dead'। ১৯৫৯ সালে এঁর একটি আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়—নাম 'Down Second Avenue। বিশ্বের নানান ভাষায় এঁর গল্পগুলি অনূদিত হয়েছে।

জেমস্ এন্‌গুগি (James Ngugi)—জন্ম কেনিয়াতে। সম্প্রতি কামপালার ম্যাক্‌রিরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে পাস করেছেন। 'Pen Point,' 'Transition' এবং 'New African' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলিতে এঁর ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। এঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'Weep not, Child'।

রিচার্ড রাইভ (Richard Rive)—দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহরে ১৯৩১ সালে জন্ম। ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়ে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। তখন থেকেই ইনি ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন। এঁর লেখা গল্পগুলি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এঁর একটি গল্প সংকলনের নাম—'African Songs' (১৯৫৭); প্রথম উপন্যাসের নাম—'Emergency'

লিনো লিটাস (Lino Leitas)—উগাণ্ডার লেখক। এঁর রচনা বিশেষভাবে মনঃস্তত্ত্ব বিষয়ক।

চিনুয়া অ্যাকেবে (Chinua Achebe)—১৯৩০ সালে জন্ম। শিক্ষালাভ ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে। নাইজেরিয়ার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত External Service Of The Nigerian Broadcasting Corporation-এর ডিরেকটর ছিলেন। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী, পেশায় মসিজীবী। প্রকাশিত গ্রন্থ: 'Things Fall Apart' (১৯৫৮), 'No Longer At Ease' (১৯৬০), 'Arrow of God' (১৯৫৭), 'A Man Of The People' (১৯৫৭। দুখানি গল্প সংকলনের নাম—'The Sacrificial Egg & Other Stories' এবং 'Girls At War & Other Stories'।

ফিলিস অ্যালট্‌ম্যান (Phyllis Altman)—পূর্ণ পরিচিতি পাওয়া যায় নি। তবে ইনি একজন আফ্রিকাবাসী।

॥ আমেরিকা ॥

ল্যাংষ্টন হিউজ (Langston Hughes)—মিশৌরির জপলিনে জন্ম ১৯০২ সালে। শৈশব ও কৈশোর কাটে কান্‌সাস্‌ ও কোলোরাডোতে। শিক্ষালাভ কলম্বিয়া ও লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে। চল্লিশ বছরের বেশি সাহিত্যিক-জীবনে ইনি বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেন—কবিতা, নাটক, ছোট গল্প ও অন্যান্য বিষয়ে। প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'The Weary Blues' (১৯২৬), 'The Big Sea' (১৯৪০), 'I wonder as I wander (১৯৫০)। বিখ্যাত নাটক 'Mulatto' এবং উপন্যাস 'Not Without Laughter' এঁর অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। এঁর সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—'The Poetry of

the Negro' (১৯৪৯) এবং 'New Negro Poets—U. S. A.' (১৯৪৯)। এঁর জীবনের বেশির ভাগ অংশ কাটে ন্যু ইয়র্কে যেখানে এঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৯ সালে।

জন হেনরিক ক্লার্ক (John Henrik Clarke)—জন্ম ১৯১৫ সালে আলাবামার ইউনিয়ন স্প্রিংস-এ। শৈশব ও কৈশোর কাটে জর্জিয়ার কলম্বাস শহরে। ১৯১৩ সালে ন্যু ইয়র্কে আসেন মৌলিক সাহিত্যের ওপর পড়াশোনা করতে। কুড়ি বছর ধরে এঁর ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। 'Harlem Quarterly'-র ইনি সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং উপন্যাস বিভাগের সম্পাদক। ১৯৬২ সাল থেকে 'Freedomways' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ইনি 'Lives of Great African Chiefs' গ্রন্থের লেখক এবং 'Harlem—U. S. A' নামক কবিতা সংকলনের সম্পাদক। হার্লেম লেখক গিল্ডের ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এঁর সম্পাদিত সংকলন-গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে—'Malcolm X' (১৯১৫) এবং 'Ten Black Writers Respond' (১৯১৫)।

ইউজেনিয়া কোলিয়ার (Eugenia Collier)—মেরিল্যাণ্ডের বালটিমোর-এ বসবাস করেন। শহরের Community College-এর ইংরেজীর অধ্যাপিকা। 'Impressions in Asphalt' পত্রিকার সম্পাদিকা। এঁর গল্প 'Marigolds'-এর জন্যে ১৯১৫ সালে এঁকে সাহিত্য-পুরস্কার দেওয়া হয়।

ক্যারোলিন রজার্স (Carolyn Rodgers)—কেবল কবি নন, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার হিসাবেও ইনি শিকাগোর জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন দক্ষিণ উপকূলের যুবসমাজের সঙ্গে। 'Negro Digest' ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় এঁর গল্প ও কবিতা ছাপা হয়েছে। 'Paper Soul' নামে এঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে।

নিক্কী গিয়োভান্নী (Nikki Giovanni)—জন্ম টেনেসীতে। 'Negro Digest' পত্রিকায় এঁর গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ ছাপা হয়। এই মহিলা-কবির প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম—'Black Judgement' (১৯১৫), 'Black Feeling, Black Talk' (১৯১৫)। ইনি 'Black Dialogue' পত্রিকার সম্পাদিকা।